আদি যুগ

(হিন্দু-বৌদ্ধযুগ)

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা ও অক্ষর এবং ডাকার্ণব

(ক) বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর

বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর—বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সাধারণ শিশুর ন্যায় জন্ম পরিগ্রহ করে নাই। ইহা ক্রম-বিবর্ত্তনের ফল। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভিক অবস্থা এইরূপ। পর্ব্বত-গাত্রনিঃসৃত গঙ্গা নদীর উৎসমূলের জটিলতার সহিত ইহা কতকটা তুলনীয়। যাহা হউক বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন বাঙ্গালাভাষা কত পুরাতন? ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে মাগধী প্রাকৃত ও তাহার অপভ্রংশ ভাষা ক্রমে বঙ্গ-ভাষায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য ব্যাপারটি একদিনে নিষ্পন্ন হয় নাই। ইহা সাধিত হইতে একাধিক শতাব্দী অতীত হইয়া থাকিবে। অনেকে অনুমান করেন খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি (শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত) বঙ্গভাষার এবং নেপালে আবিষ্কৃত আনুমানিক ৮ম।৯ম শতাব্দীর চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পর্যান্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালাভাষার ন্যায় বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। উত্তর ভারতের প্রাচীনতম লিপি "খরোষ্টি" ও "ব্রাহ্মীলিপি" নামে পরিচিত। সময়ের দিক দিয়া ইহার পর "অশোকলিপি" ও তাহার পর "গুপ্তলিপি"র উদ্ভব হয়। আর্য্যসম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলিতে দুই প্রকার লিপি ব্যবহার করিয়াছেন। কপূরদি গিরিতে তিনি যে অনুশাসন খোদিত করিয়াছেন তাহার গতি খরোষ্টিলিপির রীতিক্রমে দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে কিন্তু অপর অনুশাসনগুলিতে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লিখিবার সাধারণ রীতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। অশোকলিপি পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গুপ্তসম্রাটগণের সময়ে "গুপ্তলিপি"তে পরিণত হয়। আবার কালক্রমে "গুপ্তলিপি" হইতে নানাপ্রকার অক্ষরের প্রচার হয়। ইহাদের মধ্যে "সারদা", "শ্রীহর্ষ" ও "কুটিল" অক্ষর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "সারদা" অক্ষর হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের "কাশ্মীরী", "গুরুমুখী" ও "সিন্ধী" প্রভৃতি অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। "শ্রীহর্ষ" সংযুক্ত-প্রদেশ অঞ্চলের দেবনাগরী ও অন্য বিভিন্ন প্রকার নাগরী অক্ষরের পূর্ব্বপুরুষ।

তিব্বত দেশের প্রচলিত অক্ষরও ইহারই অনুরূপ। "কুটিল"ও ইহার সদৃশ অক্ষরসমূহ হইতে প্রাচ্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। নেপাল, বারানসী অঞ্চল, মগধ, কলিঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে এই জাতীয় অক্ষরগুলি প্রচলিত রহিয়াছে।

উল্লিখিত অক্ষরগুলির কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল। যথা,—

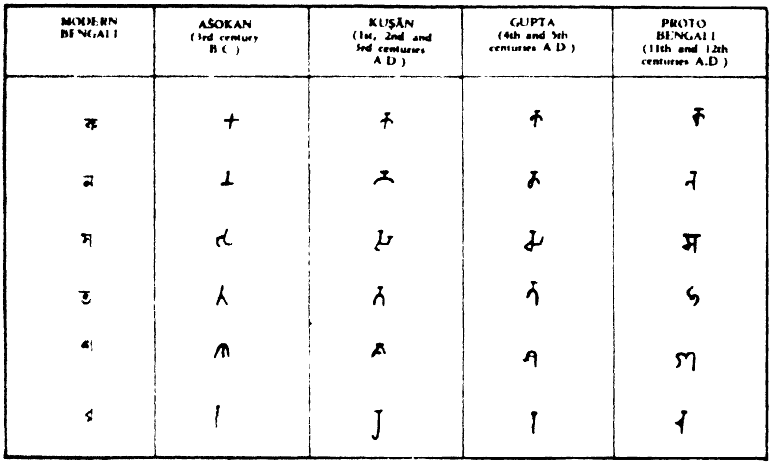

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ এই পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট বলা যায় না। প্রধান নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, নেপাল রাজ্যে। এই উপলক্ষে চারিখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে যথা—"ডাকার্ণব", "চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়", "বোধিচর্য্যাবতার" ও সরোজবজ্রের "দোহাকোষ"। এই গ্রন্থগুলির আবিষ্কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। শেষোক্ত গ্রন্থ তিনখানিতে বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ পদ বা গান রহিয়াছে। এই চর্য্যাপদগুলির বিষয়বস্তু বিশেষ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। শাস্ত্রী মহাশয় এই চর্য্যাপদগুলিকে বৌদ্ধদিগের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ইহাদের কতকগুলিকে একত্র করিয়া "বৌদ্ধগান ও দোহা" নাম দিয়া সম্পাদিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে যে অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহাদের নাম (১) ডাকার্ণব (ডাকের বচন), (২) চর্য্যাপদ (চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার ও সরোজবজ্রের "দোহাকোষ"), (৩) খনার বচন, (৪) শূন্যপুরাণ, (৫) গোপীচন্দ্রের গান ও গোরক্ষবিজয় এবং (৬) ব্রতকথা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগ ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যান্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই উল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানিতে রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য মোটামুটি (১) ভাষাতে সংস্কৃতের প্রভাবশূন্যতা, (২) ভাবের দিকে পরবর্ত্তীযুগের ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক আদর্শের অভাব, (৩) কৃষি, জ্যোতিষ ও গৃহস্থালীর জ্ঞানের প্রতি অত্যধিক অনুরক্তি এবং (৪) দার্শনিক ও তান্ত্রিক (হিন্দু ও বৌদ্ধ) আদর্শবাদ।

(খ) ডাকার্ণব

এই গ্রন্থখানি ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিকট প্রাপ্ত হন। তাঁহার ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে পুথিখানি দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন বাঙ্গালায় পরিচিত ডাকতন্ত্র ও নেপালে প্রাপ্ত ডাকার্ণবের বিষয়বস্তু প্রায় একইরূপ। আবার এই "ডাক-তন্ত্রের"ই রূপান্তর এদেশের সর্ব্বজনপরিচিত "ডাকের বচন"। সুতরাং উল্লিখিত মতানুসারে "ডাকের বচনে"র মূল "ডাকার্ণব" এবং ইহা একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ। ডাকের বচনে কিছু কিছু দুর্ব্বোধ্য ভাষার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—
"বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড। আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥" ইত্যাদি (বটতলার ছাপা পুথি)।

এইরূপ ভাষা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন দশম শতাব্দীর বাঙ্গালাভাষা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন

ডাকের বচনে একরূপ ছত্রসমূহও রহিয়াছে

(১) "ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকার জন্য তুলিয়া না থোব॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার।
আপনে মইলে কিসের আর॥"—ডাকের বচন।

(২) "যে দেয় ভাতশালা পানিশালী।
সে না যায় যমের পুরী॥"—ডাকের বচন।

(৩) "ঘরে স্বামী বাইরে বইসে।
চারি পাশে চাহে মুচ্‌কি হাসে॥
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস।
তাহার কেন জীবনের আশ॥"—ডাকের বচন।

(৪) "ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘার।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজার॥"—ডাকের বচন।

(৫) "নিয়র পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥"—ডাকের বচন।

ডাকের বচনের ছড়াগুলি নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ছড়াগুলির ভিতরে ঘরের নারী বা গৃহিণী সম্বন্ধে যে কৌতূহলোদ্দীপক সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীনকালের এতদ্দেশীয় পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেকখানি আলোক সম্পাত করে। ডাকের বচনগুলিতে কিছু জ্যোতিষ এবং বিশেষভাবে গৃহস্থালীজ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। ছড়াগুলির ভিতরে পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধে এক বিশেষ আদর্শের এবং কোন বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় রহিয়াছে। যে বিষয়সমূহ ডাকের বচনে রহিয়াছে তাহা হইল—নীতি-প্রকরণ, রন্ধন-প্রকরণ, জ্যোতিষ-প্রকরণ, ক্ষেত্র-প্রকরণ, গৃহিণী-লক্ষণ, কৃষি-লক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ ও পরিত্যাগ-কথন, ধর্ম্ম-প্রকরণ, বসতি-প্রকরণ, কুগৃহিণী লক্ষণ ও স্ত্রীদোষ-লক্ষণ, ইত্যাদি।

কতকগুলি বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হইলেও ডাকের বচনগুলি হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যথা—

(ক) বাঙ্গালা ডাকের বচনের আদর্শ "ডাকার্ণব" একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ।

(খ) "ডাকার্ণব" (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে) খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন। আবার ডাক ও খনার বচনকে খৃষ্টীয় ৮ম—১১শ শতাব্দীর রচনা বলিয়াও ডাঃ সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(গ) "বলে ডাক এই সংসার। আপনে মইলে কিসের আর।"—ইত্যাদি উক্তি ইহকালসর্ব্বস্ব হিন্দু দার্শনিক চার্ব্বাকের মতের ন্যায় একপ্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ। ইহা মহাযানী বৌদ্ধগণের অবনতির যুগের দ্যোতকও বটে, এমনকি ইহা তাহাদেরই উক্তি।

(ঘ) বৌদ্ধগণ জনহিতকর কার্য্যাবলীর সমর্থন করিত। এই হিসাবে

"যে দেয় ভাতশালা পানিশালী। সে না যায় যমপুরী॥"—ইত্যাদি তাহাদের এইরূপ মতবাদই সমর্থন করিতেছে।

(ঙ) "ডাকের বচন"সমূহ কাল্পনিক লোক মারফত কোন সম্প্রদায় বিশেষের মতবাদ না সত্যই কোন ব্যক্তিবিশেষের উক্তি? শেষোক্ত মতের উদ্ভব আসামে। সেখানকার অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে "ডাক" নামে সত্যই কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের মতে "ডাক" জাতিতে কুম্ভকার (বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত মত গোয়ালা) ছিল এবং কামরূপ জেলার বাউসী পরগণার অন্তর্গত লোহ গ্রাম (প্রবাদ কথিত লোহিডাঙ্গরা) তাহার বাসস্থান ছিল। "লোহিডাঙ্গরা ডাকের গাও" প্রবচন এবং এইরূপ আরও কতিপয় প্রবচন এইরূপ মতের সমর্থনে প্রদর্শিত হয়। অপরপক্ষে "ডাক" অর্থ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "প্রচলিত বাক্য"ও হইতে পারে। আবার ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে "ডাক" শব্দ ও "ডাকিনী" শব্দ মন্ত্রতন্ত্রাভিজ্ঞ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী অর্থে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে বৌদ্ধ "ডাকার্ণব" গ্রন্থের ভিতরে বাঙ্গালা ডাকের বচনাদি পর্য্যন্ত সংস্কৃত টিকাটিপ্পনীসহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তবে, আধুনিক ডাকের বচনের ভাষা অপেক্ষা উহা বেশ পুরাতন ও জটিল।

এমতাবস্থায় বাঙ্গালা ডাকের বচনের আদর্শ ডাকতন্ত্র ও ডাকার্ণব হওয়াই সম্ভব। ভাষাতাত্ত্বিকগণের সমর্থন লাভ করাতে চর্য্যাপদগুলির ন্যায় ডাকার্ণবের ভাষাকে খৃঃ দশম শতাব্দীর বাঙ্গালাও হয়ত বলা যাইতে পারে। তবে পণ্ডিতগণ যে ইহার ভাষাকে দশম শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহার একটু অর্থ আছে। এই শতাব্দীতে বৌদ্ধ পাল-রাজগণ বাঙ্গালা দেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহা (ডাকার্ণব) বৌদ্ধগ্রন্থ হইলে পালরাজগণের সময় এই দেশে ইহা প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এই হিসাবে পুথিখানি খৃঃ দশম শতাব্দীতে রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার অপরদিক দিয়া বিচার করিয়া পুথিখানিকে খৃঃ দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মূলে স্বীকার করিয়া লইলে ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সোজা কথায় পুথিখানি খৃঃ দশম শতাব্দীর হইলে ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৌদ্ধগ্রন্থ হইলে ইহা খৃঃ দশম শতাব্দীতে (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের সময়ে) লিখিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আসামে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মিহির নামক কোন জ্যোতির্বিদের আশীর্ব্বাদের ফলে ডাক জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিয়াই মাতাকে ডাক দিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে

মাতাকে উপদেশ দেন। এই মাতাকে ডাক দেওয়া উপলক্ষেই নাকি "ডাক" নাম হইয়াছে। যাহা হউক কথা হইতেছে জ্যোতির্ব্বিদ মিহিরকে লইয়া। কোন আসাম দেশীয় বিশেষজ্ঞ (দেবেন্দ্রনাথ বেজবড়ুয়া) বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ-মিহিরের সহিত এই প্রবাদোক্ত মিহিরকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া ডাককে বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের এক শাখার উপাধি "মিহির" ছিল বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উক্ত মতবাদ সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে যে কোন মিহিরই বরাহ-মিহির নহে। সম্ভবতঃ ডাঃ সেনের অভিমতই ঠিক।

"ডাকার্ণব" বৌদ্ধগ্রন্থ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, ইহার অপর কারণ পুথিখানি নেপালের বৌদ্ধদিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ইহারা কোন্ শ্রেণীর বৌদ্ধ তাহাও অনুমিত হইয়াছে। এই হিসাবে "ডাকার্ণব" তান্ত্রিক মতের মহাযানী বৌদ্ধদিগের অন্যতম শাখা বজ্রযানী সম্প্রদায়ের পুথি বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপ মতামতের ভিত্তিতে রহিয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে বৌদ্ধ প্রভাব। ডাকার্ণব সত্যই কি বৌদ্ধগ্রন্থ? আমরা যদি বলি ইহা বৌদ্ধগন্ধী এক শ্রেণীর তান্ত্রিক শৈব সন্ন্যাসীদের পুথি তাহা হইলে কি দোষ হয়? এই সম্বন্ধে আমাদের মতামত অপর তিনখানি তথাকথিত বৌদ্ধগ্রন্থ (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার ও সরোজবজ্রের দোহাকোষ) আলোচনা উপলক্ষেও দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের সহিত, বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালার কৃষি ও জ্যোতিষের জ্ঞানের সহিত, শিবঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"ডাক" নামটি লইয়া আর একটি প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। "ডাকের বচনের" ডাক ও "খনার বচনের" খনাকে এদেশবাসী সকলে রক্ত মাংসের জীব ছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। "ডাক দিয়া বলে রাবণ" প্রভৃতি উক্তিতে ডাক কথাটি অন্য অর্থবাচক হইলেও রাবণের সত্যকার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এদেশবাসী জনসাধারণ অত্যন্ত বিশ্বাসী সন্দেহ নাই। খনা বা রাবণ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মতামতই পোষণ করি না কেন ডাকের অস্তিত্বের স্বপক্ষেও দুই একটি কথা বলিবার আছে। ডাক সত্যই একটি ব্যক্তি বিশেষ হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ এই নামের একটি ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আসাম প্রদেশে এত কিম্বদন্তি ও নিদর্শন রহিয়াছে তখন উহা একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে কি?

এই উপলক্ষে অপর একটি বিষয়ও প্রণিধান যোগ্য। ডাক নামক ব্যক্তিটি জাতিতে কুম্ভকার ও মতান্তরে গোয়ালা এবং আসামের কামরূপ জেলার অন্তর্গত লোহিডাঙ্গরা গ্রামের অধিবাসী বলিয়া কথিত হইলেও সেই জেলায় বা তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ডাকার্ণবের পুথি পাওয়া যায় নাই। কামরূপ জেলা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত নেপালরাজ্যে এবং হিমালয় পর্ব্বতের নিভৃত ক্রোড়ে ডাকার্ণব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাও আবার কোন গৃহীর নিকট হইতে নহে, কোন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে। ইহার অর্থ কি? গৃহীর প্রতি উপদেশপূর্ণ পুথিতে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কি প্রয়োজন? এই সব কারণ পরম্পরা সন্দেহ হয় যে ডাক সত্যই কোন জ্ঞানী (বৌদ্ধ বা হিন্দু) ব্যক্তি বিশেষের নাম। গোয়ালাজাতীয় এই ব্যক্তিটি বোধহয় প্রথমজীবনে গৃহী এবং "ডাকের বচনের" রচনাকারী হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী জীবনে এই ব্যক্তিটি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকিলে এবং এই উপলক্ষে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত থাকিলে তাহারা যে সব স্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইত নেপাল তাহাদের অন্যতম স্থান হয়ত ছিল। কিন্তু ডাক অল্পবয়সে জলে ডুবিয়া মারা যান একরূপ প্রবাদ আছে। ইহা সত্য হইলে তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তবুও ডাকের সহিত অন্ততঃ কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পণ্ডিতপ্রবর ভিনসেন্ট স্মিথের মতানুসারে ইহাও বলা যায় যে মুসলমান আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইলে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ বহু পুথি বিহার ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ হইতে সন্ন্যাসিগণ নেপালে লইয়া পলাইয়া যান। "ডাকার্ণব" এইরূপ একখানি পুথিও হইতে পারে। ইহার ফলেই নেপালরাজ্যে "ডাকার্ণব" পুথিটি পাওয়া যায়। ডাকের দলস্থ সন্ন্যাসীগণ মহাযানী বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্প্রদায় না শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল তাহা এখন বলা কঠিন, বরং পুথিখানি বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিকটই পাওয়া গিয়াছে। অথচ পুথির বিষয়বস্তু, শৈব ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়দ্বয়ের পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের লক্ষণ তান্ত্রিকতা, বৌদ্ধধর্ম্মের নামগত ও আদর্শগত বহু বিষয়ের স্পষ্ট অভাব প্রভৃতি পুথিখানিকে শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের চিহ্নযুক্তও করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধগণের নিকট পুথিখানি প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার (essential) না হইয়া অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার (accidental) হওয়াও বিচিত্র নহে।

ডাকার্ণবের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে মনে হয় ইহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধমতও নহে এবং সম্পূর্ণ হিন্দুমতও নহে। হিন্দু চার্ব্বাক মতের সহিত ইহার বেশ মিল রহিয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। পরোপকারার্থে বৃক্ষরোপণ এবং পুষ্করিণী খনন শুধু বৌদ্ধদেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা হিন্দুমতেরও দ্যোতক। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ মৌর্য্য সম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলির ভিতরে জীবহিংসা নিষেধাত্মক, পরোপকারবাঞ্জক ও গুরুসেবার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক উপদেশ খোদিত করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই মতসমূহের পরিপোষক নীতিগুলি আবহমানকাল হইতে এই দেশে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ডাকার্ণবকে সম্পূর্ণ বৌদ্ধগ্রন্থ না বলিয়া বৌদ্ধভাবমিশ্রিত হিন্দুগ্রন্থ বলাই বোধ হয় অধিকসঙ্গত।

প্রসন্ন-বুদ্ধ

পঞ্চম অধ্যায়

চর্য্যাপদ *

(ক) **চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়** (কাহ্নপাদ সংগৃহীত)

(খ) **বোধিচর্য্যাবতার** ([illegible])

দোহাকোষ (সরোজবজ্রকৃত)

চর্য্যাপদের পুথি দুইখানির প্রথমটি সম্পূর্ণ ও দ্বিতীয়টি খণ্ডিত আকারে নেপালে পাওয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের পুথি দুইখানি ছাড়া সরোজবজ্রের দোহাকোষও নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিগুলির আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি কতকগুলি চর্য্যাপদ ও কতিপয় দোহা একত্র করিয়া বৌদ্ধগান ও দোহা নামে সম্পাদিত করিয়াছেন। এই পুথিগুলি ছন্দে নিবদ্ধ কতকগুলি পদের সমষ্টি। অনেক পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবপদগুলির সহিত চর্য্যাপদগুলি তুলনীয়। বৈষ্ণবপদের ন্যায় চর্য্যাপদও সম্ভবতঃ গীত হইত। চর্য্যাপদগুলির ভিতরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মেরই চিহ্ন রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এমন এক যুগ ছিল যখন মহাযানী বৌদ্ধ, শৈব হিন্দু ও শাক্ত হিন্দুর মধ্যে দার্শনিক মত ও তান্ত্রিক আচারের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। শুধু মত বিচার করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধকে পৃথক করা দুরূহ। শৈব ও শাক্ত ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মেও পরবর্ত্তীকালে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। তান্ত্রিক আচার সম্বন্ধে এদেশে শৈবগণই প্রথম পথপ্রদর্শক ছিল বলা যাইতে পারে। ইহা বলিবার কারণ এই যে শৈব ধর্ম্মাশ্রিত প্রাচীন পামিরীয় জাতিই প্রথমে এই দেশে তান্ত্রিক মতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। শিব দেবতার সহিত তন্ত্রের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই ইহার অন্যতম প্রমাণ। পামিরীয়গণ যে অতি প্রাচীনকালে এমনকি হয়ত বেদ-পূর্ব্ব যুগে এই দেশে শৈব ধর্ম্ম ও তৎসহ তান্ত্রিকতা আনয়ন করিয়াছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। তাহার পর মঙ্গোলীয় মাতৃকাপূজকগণ বা শাক্তগণ উল্লেখযোগ্য। শাক্ত তান্ত্রিকগণের পর মহাযানী বৌদ্ধগণ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম কি ৮ম শতাব্দীতে তান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময়ে তিব্বত দেশেও মহাযানী শাখার

* চর্য্যাপদসমূহের বিভিন্ন সম্পাদনা গ্রন্থও দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধ গান ও দোহা (H. P. Sastri) ও Origin and Development of Bengali Language (Introduction) by S. K. Chatterjee দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। ইহাদের পরে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের মধ্যেও তান্ত্রিক প্রভাব দেখা যায়।

মহাযানী বৌদ্ধদের যেমন বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামক চারিটি শাখা তদ্রূপ তান্ত্রিকমতও বিভিন্ন প্রকার থাকাতে নানাশাখার তান্ত্রিক রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "বামাচারী" তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদিগের সহিত ও মহাযানী বৌদ্ধদের কোন কোন সম্প্রদায়ের সহিত চর্য্যাপদগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। "বামাচারী" সন্ন্যাসী বলিলেই অনেকে বৌদ্ধতান্ত্রিক সন্ন্যাসী বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা ভুল। "বামাচারী"গণ স্ত্রীলোক নিয়া সাধনা করিবার পক্ষপাতী এবং ইহারা তান্ত্রিক। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসী বলিলে প্রধানতঃ শাক্ত "বামাচারী" সন্ন্যাসী বুঝাইয়া থাকে যেমন "বীরাচারী" সন্ন্যাসী বলিলে শৈব সন্ন্যাসী বুঝাইয়া থাকে। বৌদ্ধতান্ত্রিক ও শৈবতান্ত্রিকগণের মধ্যেও কিছু কিছু "বামাচারী" শ্রেণীর সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব থাকিলেও "শাক্ত বামাচারীগণের" ন্যায় তাহারা ততটা উল্লেখযোগ্য নহে। শৈব ও শাক্তগণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হেতু কোন বামাচারী সন্ন্যাসী শৈব না শাক্ত তাহা হঠাৎ নির্ণয় করা কঠিন।

স্বামী প্রণবানন্দ তাঁহার একটি ইংরেজী পুস্তকে (Exploration in Tibet) কৈলাশ পর্ব্বত সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় এই পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই মান্য। উভয়েরই বিশ্বাস এই পর্ব্বতের চূড়ায় (সুতরাং অধিক সম্মানের স্থানে) "হর-গৌরী" বিরাজ করেন। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধগণের মতে পর্ব্বতের নিম্নদেশে (সুতরাং "হর-গৌরীর" নীচে) বোধিসত্ত্বগণ অবস্থান করেন। এইরূপ বিশ্বাসের মূলে শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় অথবা উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সদ্ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। শিবদেবতাতে পৌরাণিক বর্ণক্ষেপ করিয়া আর্য্যগণ অনেক পরবর্ত্তীকালে এই আর্য্যেতর দেবতাটিকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। আবার অনেককাল গত হইলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে শিবদেবতার একান্ত উপাসক দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী শঙ্করাচার্য্য যে মায়াবাদ সারাভারতে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই দেবতাটির গাত্রে বহু ধর্ম্ম ও বহু জাতির চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধের সমাধির সহিত শিবের সমাধির সাদৃশ্য প্রদর্শন খুবই সহজ। তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণের এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের "বজ্রযান ও সহজযান" নামক শাখাদ্বয়ের মতবাদের সহিত যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত-বিশ্বাসী কোন কোন শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মতবাদের যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া শুধু মতবাদ উল্লেখ করিয়া উহা হিন্দু কি বৌদ্ধ

তাহা প্রমাণ করা সহজ নহে। পরস্পর নৈকট্য ও সৌহার্দ্দ্যানিবন্ধন অনেক বৌদ্ধ শৈবমত এবং অনেক শৈব বৌদ্ধমত আংশিকভাবে তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবে। এই উপলক্ষে শৈব "বিন্দুবাদ" ও বৌদ্ধ "শূন্যবাদ" এতদুভয়ের সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূল উপাস্য দেবতার স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলে শুধু দার্শনিক মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য দেখান কঠিন। ইহা ছাড়া আর একটি কথা বলা যায়। মৃত্যুর ও মহাকালের প্রতীক হিসাবে শিবের ভিতরে বৌদ্ধ শূন্যবাদ প্রবেশ করা সহজ-সাধ্য বলিয়াই মনে হয়।

শূন্যতার বিশেষ ব্যাখ্যার উপর ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বৌদ্ধ শূন্যবাদের যে নানারূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহার কোন কোনটির সহিত "বিন্দু"তে পরিণত পরম শিবের ব্যাখ্যার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, এমনও হইতে পারে চর্য্যাপদ বৌদ্ধদিগেরই রচিত পুথি, কিন্তু বুদ্ধ বা তথাগতের নামগন্ধ ইহাতে দেখা যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা একেবারে বৈদান্তিক মায়াবাদ ও যোগশাস্ত্রের কথা এবং কিয়ৎপরিমাণে শূন্যতার আভাস। এমতাবস্থায় আমরা যদি চর্য্যাপদের অনেক পদই বৌদ্ধ ভাবাপন্ন শৈব সন্ন্যাসীদের পদ বলি তবে কি ভুল হয়? শৈব নাথপন্থী যোগী-গুরুগণের কোন কোন নাম এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন "কাহ্ন" বা "কানুপা"।

চর্য্যাপদগুলিতে ব্যখ্যাত মায়াবাদের কিছু নিদর্শন নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) "আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী—কাহ্নপাদ

চিত্তে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন মোহ কিরূপ বিপদ ঘটায় এই ছত্রটি দ্বারা তাহাই বুঝান যাইতেছে।

(২) "মন তরুবর গঅন কুঠার।
ছেবহ সো তরুমূল, ন ডাল॥"—কাহ্নপাদ

পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত মন যত বাসনার মূল। ইহাকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া সমূলে বিনষ্ট করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যোগশাস্ত্র শৈব যোগীদের প্রধান অবলম্বন। এই যোগশাস্ত্রের অনেক কথা হিন্দুও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছে। চর্য্যাপদসমূহে এই যোগশাস্ত্রের অনেক তত্ত্বই লিপিবদ্ধ আছে।

চর্য্যাপদের ভাষা সাঙ্কেতিক ও প্রহেলিকাপূর্ণ। এইজন্য ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার "সন্ধ্যাভাষা" নাম দিয়াছেন। এই "সন্ধ্যাভাষা বা

আলো-আঁধারি ভাষাকে কেহ কেহ "সন্ধ্যা"-ভাষা নাম দিয়াছেন। ইহা তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিবার জন্য একপ্রকার স্বতন্ত্র ভাষা।

চর্য্যাপদের রচনাকারী সন্ন্যাসিগণের অনেকেই শৈব যোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেক পদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় "সহজানন্দ" নামক একপ্রকার আনন্দলাভ। এই "সহজানন্দ" সম্বন্ধে কাহ্ন বলিয়াছেন—

'গুণ কইসে সহজ বোল বুঝাঅ।
কাঅবাক্ চিঅ জসু ন সমাঅ॥
আলে গুরু উএসই সিস।
বাক্‌পথাতীত কহিব কিস॥
মোহেব বিগো আকহণ না জাই"—কাহ্নপাদ

অর্থাৎ, অবাঙমনসোগোচর সহজবাণী কিপ্রকারে বুঝান সম্ভব? তাহা বুঝাইয়া বলা সম্ভব নহে।

সহজানন্দলাভ উপলক্ষে এক শ্রেণীর যোগিগণ চর্য্যাপদের বিশেষার্থ-বোধক কতিপয় বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "মহাসুখ" "শূন্যবাদ", "নির্ব্বাণ", "করুণা", "বোধিচিত্ত" প্রভৃতি প্রধান। এই বিষয়গুলি তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণকেই বেশী লক্ষ্য করিতেছে। আবার সাধনভজনের যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে প্রকার হেয়ালীর ভাষায় যোগ-শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালার শৈব নাথপন্থী যোগিগণের রীতিনীতির সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ আছে। বাঙ্গালা "গোরক্ষবিজয়" গ্রন্থের নাম এই উপলক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ঢেণ্ঢনের রচিত—

"টালত মোর ঘর নাহি পরবাসী।
ঘরেতে ভাত নাহি নিতি উবাসী॥
বেঙ্গ সংসার বডহিল যায়।
দুহিব দুধু কি বেণ্টে সামায়॥"—

প্রভৃতি পদের সহিত গোরক্ষবিজয়ের গোরক্ষনাথ ও মীননাথের প্রশ্নোত্তর-সমূহ তুলনা করা যাইতে পারে। চর্য্যাপদের সিদ্ধাচার্য্যগণ "নৈরাত্মা দেবীকে" (জ্ঞানময় সত্ত্বাকে) অস্পৃশ্যা "ডোম্বী" বা ডোমনারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে বেশ তান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ রহিয়াছে। বামাচারী শাক্ত তান্ত্রিকগণের "গুপ্তসাধন তন্ত্র" নামক গ্রন্থে নারী নিয়া সাধনার পদ্ধতির উল্লেখ আছে।

যে সব শ্রেণীর নারী তাহাদের মতে সাধনায় প্রশস্ত তাহাদের নিম্নরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। যথা,--

"নটী কপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যা প্রকীর্ত্তিতা।
বিশেষ বৈদগ্ধযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ শীলসৌভাগ্যশালিন্যঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধঃ ভবেন্নরঃ॥"

গুপ্তসাধন তন্ত্র।

"গুপ্তসাধন তন্ত্রে" উল্লিখিত "কপালিকী" ডোমনারী পদবাচ্য। এই শ্রেণীতে শবরী, চণ্ডালিনী, শুঁড়িনী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর নারীকেও ধরা যাইতে পারে। ইহাদের ছাড়া উচ্চ শ্রেণীর নারীর, যথা "ব্রাহ্মণী"র, উল্লেখ তো রহিয়াছেই।

প্রাচীনকালে পৃথিবীব্যাপী লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। লিঙ্গপূজকগণের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষে এবং সকলের মধ্যেই যৌন-ব্যাপারের পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়া ধর্ম্মসাধনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে লিঙ্গ পূজার ন্যায় তান্ত্রিক পূজা-বিধিও সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-ভারতে, তান্ত্রিক মতানুবর্ত্তী শিবলিঙ্গ পূজকগণের সহিত শক্তি পূজকগণের সম্মেলনের ফলে যৌন-ঘটিত বিষয় তন্ত্রের অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার ফলেই নারীসম্ভোগের ভিতর দিয়া পরমানন্দ বা আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের (সহজানন্দ) প্রচেষ্টা ও তাহার বিধি প্রচলনের চেষ্টা হয়। এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। সাধন-ভজনে নিম্নশ্রেণীর নারীর আধিক্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষে, তথা বাঙ্গালা দেশে, নানা ধর্ম্মমতের উত্থানপতনের সহিত এই দেশের অধিবাসী নানা জাতির প্রচেষ্টা ও সংমিশ্রণ জড়িত আছে। এই দিক দিয়া তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নারী বুঝাইতে অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় জাতির সংস্রব সূচিত করে কি না তাহা কে বলিবে। নারীসম্ভোগের সাহায্যে সহজানন্দলাভের চেষ্টা মহাযানী বৌদ্ধদের বিভিন্ন শাখাতেও ক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এমনকি বৈষ্ণবগণের এক সম্প্রদায়ও (সহজিয়া সম্প্রদায়) এই মতবাদ গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ কামনা বা বাসনার পরিতৃপ্তির দ্বারা ক্রমে ইহার উপর জয়লাভ করাই এই প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। যৌনবোধ ও

কামবাসনা। হিন্দুমতে ষড়রিপুর প্রধান রিপু। হিন্দুমতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়রিপু এবং বৌদ্ধমতেও অনুরূপ কতিপয় রিপু স্বীকৃত হইয়াছে। কামরিপু সকল রিপু অপেক্ষা বলবান বোধে তাহার নিরোধের জন্যও নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের "সহজমত" ইহাদের অন্যতম উপায় মাত্র। উভয়ের মতেই যেহেতু সংস্কার, মুক্তি (মোক্ষ বা শূন্যত্ব) সাধনার প্রধান অন্তরায় সেই হেতু কামপরিচর্য্যাতেও লোকাচার, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি রাখিতে নাই। বামাচারী তান্ত্রিকগণের (হিন্দু ও বৌদ্ধ) বীভৎস ক্রিয়াকলাপ এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। শাক্ত কাপালিক ও শৈব অঘোরপন্থী সন্ন্যাসীদের জঘন্য কার্য্যকলাপও সংস্কার-মুক্তির চেষ্টাই সূচিত করে।

তান্ত্রিকতার সহিত দার্শনিকতার সংযোগ সাধিত হইলে একদিকে বেদান্তের মায়াবাদ (যথা শঙ্করাচার্য্যের মত) ও অপরদিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যোগশাস্ত্র তান্ত্রিকতার প্রণালী নির্দ্দেশ করে এবং বেদান্তের মত পরবর্ত্তী সময়ে ইহার সহিত যুক্ত হইয়া যে রূপদান করে তাহার অন্যতম ফল "পরকীয়া" মত। এই মত জীবাত্মা-পরমাত্মা ঘটিত উচ্চ দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণের নিকট সহজিয়াগণ কর্ত্তৃক ইহার সাধন-ভজন ও আচরণের দিক বামাচারী তান্ত্রিকগণের আচরণের ন্যায়ই বিশেষ নিন্দনীয়। শৈব-হিন্দু ও মহাযানী-বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ই দার্শনিক মতের দিকে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও প্রণালীর দিকে তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মত উভয়েরই নানাশাখা গ্রহণ করিয়াছিল এবং ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতের মধ্যেও অনেকটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। মহাযানী বৌদ্ধগণের সকলেই তান্ত্রিক নহে এবং সকলেই "সহজিয়া" ও "পরকীয়া" মতাবলম্বী নহে। এইরূপ শৈবসম্প্রদায়ের সকলেই "সহজিয়া" ও "পরকিয়া" সমর্থক নহে। ইহার উদাহরণস্বরূপ শৈব নাথ-পন্থী সন্ন্যাসিগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। "সহজিয়া" ভাবাপন্ন কানুভট্ট-সংগৃহীত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের অনেক পদ সহজিয়া মতের দ্যোতক হইলেও সব পদই এই মতের পরিপোষক মনে করিলে ভুল হইবে। ইহাতে তুল্যরূপ নাথপন্থী মায়াবাদীদের মতও প্রচুর রহিয়াছে। অন্ততঃ আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। চর্য্যাপদগুলিতে নানারূপ বিরোধী মত জট পাকাইয়া বিষয়বস্তুকে আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছে। অনেকগুলি চর্য্যাপদ আবার মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত ও শিবের প্রতি

প্রভাবিত তিব্বত দেশে রক্ষিত হওয়ার ফলে তিব্বতি ভাষায় ইহার কিছু কিছু রূপান্তর হেতু চর্য্যাপদগুলির প্রকৃত অর্থসমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। চর্য্যাপদগুলির রচনারীতিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও রহস্যময় (mystic) ভাষার পদ্ধতি (technique) ব্যবহৃত হওয়ার কারণ যে তান্ত্রিকতা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কোন শ্রেণীর তান্ত্রিকতা—হিন্দু না বৌদ্ধ? আমরা ইতঃপূর্ব্বে অনেক চর্য্যাপদের রচনাকারী যে শৈব-হিন্দু সন্ন্যাসী ইহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপ মত প্রকাশ করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তিব্বত ও অন্য স্থানের অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিকও চর্য্যাপদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে চর্য্যাপদের পুথিগুলি তান্ত্রিকমত, বৌদ্ধমত, বেদান্তমত ও যোগশাস্ত্রের মতের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহার ফলে চর্য্যাপদগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ লেখকগণের রচনার সম্মিলিত সংগ্রহ মাত্র এবং সহজিয়া মতানুবর্ত্তী কান্তভট্ট (১০ম শতাব্দী) নামক কোন ব্যক্তি "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে"র অন্তর্গত পদগুলির প্রসিদ্ধ সংগ্রহকর্ত্তা বলা যায়।

"মহাসুখ", "করুণা" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যে সব পদ রচিত হইয়াছে অথবা যেসব পদকর্ত্তা বা সিদ্ধাচার্য্য নিশ্চিত বৌদ্ধ বলিয়া সমালোচকগণ কর্তৃক চিহ্নিত হইয়াছেন সেই সব পদকর্ত্তা বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে। অপর পদগুলি এবং তাহাদের পদকর্ত্তাগণ অবশ্য হিন্দু। আবার উভয় শ্রেণীর পদেই উভয় মতের ছাপ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সিদ্ধাচার্য্য বলিতে নাথ-পন্থী সাহিত্যে শৈব সন্ন্যাসীকেই বুঝাইয়া থাকে এবং এই সাহিত্যে উল্লিখিত সিদ্ধাচার্য্যগণের কয়েকজন আবার চর্য্যাপদেরও পদকর্ত্তা বলিয়া নাম সাদৃশ্যে অনুমিত হইয়া থাকেন, যেমন কাহ্নপাদ। এই কাহ্ন আবার সরোজবজ্রের দোহাকোষের কতিপয় দোহারও রচনাকারী।

চর্য্যাপদগুলি কোন সময়কার রচনা? সরোজবজ্রের দোহাগুলিই বা কখন রচিত হইয়াছিল? ইহা স্থির হইয়াছে যে দোহা ও চর্য্যাপদ দুইপ্রকারের রচনা এবং এই উভয়ের মধ্যে দোহাগুলি চর্য্যাপদ অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যবর্ত্তী ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলা হয় এবং এই দোহাগুলি অপভ্রংশ ভাষার নিদর্শন বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। যে দোহাগুলি নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার রচনাকারী প্রধানতঃ সরোজবজ্র নামক এক ব্যক্তি এবং আংশিকভাবে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্ন। এই কাহ্ন আবার কতকগুলি চর্য্যাপদ বা সঙ্গীতের পদও রচনা করিয়াছিলেন। চর্য্যাপদগুলির ভিতরে মায়াবাদীদিগের সংসার-বৈরাগ্য ও বামাচারীদিগের নারীসাধনার সহজিয়া

মত, এই উভয় মতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চর্য্যাপদগুলির সংগ্রহকারক কান্থভট্ট একজন সহজিয়া মতানুবর্ত্তী ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদগুলির অনুবাদ, অনুলিপি ও সদৃশ বহুপদ তিব্বতি ভাষায় পাওয়া গিয়াছে। "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থখানি সম্পূর্ণাবস্থায় পাওয়া যায় নাই এবং খণ্ডিত পুথি হইলেও ইহা "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চিয়ে"র অনুরূপ পুথি ইহা বলা যাইতে পারে।

কান্থভট্ট খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া স্থির হইলেও চর্য্যাপদগুলি অবশ্য সকলই এই সময়ের রচনা বলিয়া ধরা যায় না, কারণ সিদ্ধাচার্য্যগণ সকলেই এক সময়ের ব্যক্তি নহেন। নামসাদৃশ্যে কানুপা কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তিনি যোগীগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার শিষ্য ছিলেন। গোরক্ষনাথের সময় নিয়া অনেক আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত "শঙ্কর-দিগ্বিজয়" গ্রন্থে এই গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। আবার বাঙ্গালা গোপীচন্দ্রের গানেও তাহার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। ইহার ফলে খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন সময় গোরক্ষনাথের কাল বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ের সমর্থনে বহু কিংবদন্তি রহিয়াছে।

যাহা হউক চর্য্যাপদগুলি আনুমানিক খৃষ্টীয় ৮ম।৯ম শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দোহাগুলিতে (যথা সরোজবজ্রের দোহাকোষের দোহাসমূহ) অপভ্রংশ ভাষার নমুনা রহিয়াছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বের রচনা হইলে এইগুলি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দীতে রচিত হওয়ারই সম্ভাবনা। সোজা কথায় গুপ্তযুগের অবসানের পর (খৃঃ ৪র্থ।৫ম শতাব্দী) প্রথমে দোহা ও পরে চর্য্যাপদগুলি রচনার আরম্ভ এবং মোটামুটি বাঙ্গালার পালরাজগণের রাজত্বের অবসানের সহিত ইহার শেষ বলা যাইতে পারে।

ভাষাবিদ্‌গণের মতানুসারে দোহাগুলি অপভ্রংশ ভাষার নমুনা এবং চর্য্যাপদগুলির সহিত প্রাচীন মৈথিলী ও পূর্ব্ব-বিহারের ভাষা, প্রাচীন ওড়িয়া ভাষা এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। এই ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রাকৃতের পরবর্ত্তী অবস্থা অপভ্রংশ ভাষা। চর্য্যাপদগুলি অপভ্রংশেরও পরবর্ত্তী অবস্থা সূচিত করিতেছে। এই হিসাবে এগুলি খৃঃ ৮ম।৯ম শতাব্দীর রচনা বলিয়াই গণ্য করা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালাকে এক সময়ে "প্রাকৃত"ও বলিত। দোহা ও চর্য্যাপদগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার আদিরূপ বলিয়া গণ্য হওয়াতে অন্ততঃ চর্য্যাপদগুলির ভাষা বাঙ্গালার পালরাজাদিগের সময়ে বর্ত্তমান ছিল বলা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খনার বচন

"খনার বচন" কত পুরাতন তাহা বলা সহজ নহে। তবে ইহা অন্তত: চর্য্যাপদের যুগের অর্থাৎ ৮ম।১০ম শতাব্দীর হওয়া বিচিত্র নহে। ডা: দীনেশ-চন্দ্র সেন এইরূপই অনুমান করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় ইহা আরও পুরাতন। ইহার কারণ বলিতেছি। খনার বচনের বিষয়-বস্তুর প্রধান ভাগ কৃষিবিষয়ক। ইহাতে ছড়ার আকারে এমন সব কৃষিবিষয়ক উপদেশ রচিত হইয়াছে যাহা বাঙ্গালার কৃষির অত্যন্ত উন্নতির সময় নির্দ্দেশ করে। কৃষি সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় কৃষককুলের সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। খনার বচনে প্রাপ্ত মন্তব্যগুলি ইহার ফলে দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যক্ষ সত্যের আসন গ্রহণ করিয়াছে। খনা নামক একজন বিদুষী নারী ছিলেন এবং "বচন"গুলি তাঁহারই রচনা বলিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশ্বাস। এই মহিলার জীবনের সহিত রাক্ষস-সংশ্রব ছিল ও উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" সভার বরাহ-মিহিরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। ইহা একদিকে বাঙ্গালীর কৃষিজ্ঞানের মূলে "রাক্ষস" নামক কোন অনার্য্য জাতির দানের ইঙ্গিত এবং অপরদিকে "বচন"গুলি রচনার সময়ের সহিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের আভাস দিতেছে। খনা ও তাঁহার "বচন"গুলি সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তি প্রচলিত রহিয়াছে তাহা তেমন বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে। কিন্তু উহা যে সময়ের নির্দ্দেশ করে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে কি? মূলে কিছু সত্য ঘটনা না থাকিলে কিংবদন্তিগুলি কিসের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইবে? অন্ততঃপক্ষে উহা কোন গৌরবময় হিন্দু-যুগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কথাসাহিত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও "বিক্রমাদিত্য" নাম অথবা উপাধিযুক্ত একাধিক হিন্দু রাজা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই রাজা গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হইতে পারেন বলিয়া অন্যতম ঐতিহাসিক মত আছে। কোন কোন মতে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবই গল্পের বিক্রমাদিত্য। ইনি যে স্বনামধন্য ব্যক্তিই হউন খৃষ্টীয়

৪র্থ/৫ম শতাব্দীর দিকেই খনার গল্পের রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" সভার কথা এই দেশের জনসাধারণের নিকট অতি সুপরিচিত। মহাকবি কালিদাস "নবরত্নের" শ্রেষ্ঠতম রত্ন ছিলেন বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ-মিহির এই নবরত্নের অন্যতম রত্ন। মতান্তরে বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে *বরাহ পিতা ও মিহির পুত্র এবং উভয়েই বিক্রমাদিত্যের রাজসভার জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। খনা মিহিরের স্ত্রী ছিলেন এদেশের এইরূপই কিংবদন্তি।* যাহারা বরাহ-মিহিরকে এক ব্যক্তি অনুমান করেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ "মিহির" কথাটি যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের একটি শাখার উপাধি অদ্যাপি রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "মিহির" কথা বা উপাধি দেখিলেই উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে আপত্তি করেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার কিম্বদন্তি অনুসারে বরাহ ও মিহির দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইঁহারা দুই বা এক ব্যক্তি হউন তাহা নিয়া আমাদের কথা নহে। খনার গল্পটি যে "গুপ্তযুগ"কে (৪র্থ—৫ম খৃঃ) নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "খনার বচন" এই সময়ে প্রথম রচিত হইয়া থাকিলে উহা চর্য্যাপদের এবং হিন্দু-বৌদ্ধ দোহাগুলিরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য বচনগুলির বর্ত্তমান ভাষা প্রাচীন ভাষার অনেক পরিবর্ত্তনের ফল সন্দেহ নাই।

রাজতরঙ্গিণীর "বঙ্গ-রাক্ষসৈঃ" কথাটি বঙ্গদেশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় এবং "খনার বচন" বাঙ্গালা ভাষাতেই পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক খনা বাঙ্গালী ঘরের নারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। খনার রাক্ষসদেশে জন্ম কথাটি বাঙ্গালা দেশকেই বুঝাইয়া থাকিবে। এই সব কারণে জনসমাজে খনা বাঙ্গালী নারী বলিয়া গৃহীত হওয়ায় আমরাও সন্দেহের সুযোগ নিয়া এই মতই গ্রহণ করিলাম। এই উপলক্ষে বরাহ-মিহির সম্বন্ধে ইহাও সন্দেহ হয় যে নামসাদৃশ্যে হয়ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম রত্নের সহিত নাম দুইটি লৌকিক কল্পনায় যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে গুপ্তযুগের ইঙ্গিত "খনার বচন" রচনা উপলক্ষে পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন বাঙ্গালার কৃষকদিগের সম্বন্ধে প্রাচীনতম ছড়া মনে করেন এবং উভয়েরই রচনাকাল ৮০০-১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া অনুমান করেন। আমাদের মনে হয় অন্ততঃ খনার বচন আরও পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ গুপ্তযুগের রচনা এবং যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নবকলেবর প্রাপ্ত

হইয়াছে। তবে ডাকের বচনের সময়ে যে খনার বচনও প্রচলিত ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দেশে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা। উত্তর ভারতে এই সম্পর্কে মৌর্য্য ও গুপ্তরাজগণের কাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং মৌর্য্যযুগে যদি বচনগুলির উদ্ভব হয় উত্তম, নতুবা অন্ততঃ ইহার পরবর্ত্তী গুপ্তযুগে (৪র্থ-৫ম শতাব্দী) খনার বচনগুলি রচিত হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। খনা লঙ্কার রাক্ষস কন্যা এবং বিক্রমাদিত্য রাজার সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতির্বিদ বরাহের সমুদ্রে পরিত্যক্ত পুত্র মিহিরের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া ও রাক্ষস দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। খনার জীবনের সহিত লঙ্কা ও সমুদ্র-তীরবাসী রাক্ষসসংস্রব আর্য্যেতর যে জাতির নির্দ্দেশ দেয় তাহারা নাগজাতির ন্যায় Austric গোষ্ঠীভুক্ত হইলে হইতে পারে। বাঙ্গালাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার বহু দেশের সঙ্গেও খৃষ্ট জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, Austric জাতির উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে (যথা "বঙ্গ-রাক্ষসৈঃ" কথা)। প্রাচীন Chaldaean-গণের ন্যায় এই রাক্ষস নামীয় Austric-গণ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। তবে খনার জীবনের ঘটনা বিশ্বাস করিতে হইলে রাক্ষসগণের সমাজে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই হিসাবে বচনগুলি মূলে অষ্ট্রিক জাতির হওয়াও অসম্ভব নহে।

খনা কোন কাল্পনিক মহিলা, না সত্যই তাঁহার অস্তিত্ব ছিল? "ডাকের বচনের" ডাক ও "খনার বচনের" খনার প্রকৃত অস্তিত্ব থাকুক আর না থাকুক এই দুইজন বাঙ্গালী চিত্তের কল্পলোকে চিরদিন বিরাজ করিবে। খনার প্রথম জীবন নানা কিংবদন্তির ফলে ঘনকুহেলিকাচ্ছন্ন। এক মতে খনার রাক্ষসদেশে জন্ম ইহা বলা হইয়াছে। আবার অপর মতে খনার পিতার নাম ছিল "অটনাচার্য্য"। "আমি অটনাচার্য্যের বেটি। গণতে গাঁথতে কারে বা আঁটি॥" এই প্রবচন হইতে ইহাও মনে হয় যে খনার পিতাও খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসত সবডিভিসনে দেউলি নামে যে গ্রাম আছে সেখানে মিহির ও খনার আবাসস্থল ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বর্ত্তমান দেউলি গ্রাম চন্দ্রকেতু নামক কোন রাজার চন্দ্রপুর নামক গড়ের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার অনেক ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে খনা ও মিহির "চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রয়ে চন্দ্রপুর

নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই।" (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড)

"খনার বচন" সাধারণতঃ কৃষিতত্ত্ববিষয়ে উপদেশপূর্ণ কতকগুলি ছড়া। প্রথমে হয়ত ইহা মুখে মুখে আবৃত্তি হইয়া ক্রমে লিখিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন যুগে লিখিত ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। খনার বচনের ছড়াগুলিকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা,—

(ক) কৃষিকার্য্যে প্রথা ও কুসংস্কার, (খ) আবহাওয়া জ্ঞান, (গ) কৃষিকার্য্যে ফলিত জ্যোতিষ জ্ঞান, এবং (ঘ) শস্যের যত্ন সম্বন্ধে উপদেশ (সারতত্ত্ব ও রোগ আরোগ্যতত্ত্ব)। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) আষাঢ়ের পঞ্চদিনে রোপয়ে যে ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান ॥—খনা

(২) ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট।
সেই তিল দা'য়ে কাট ॥ ইত্যাদি।—খনা

(এই সব ছড়া খুব প্রাচীন প্রথাসমূহ নির্দ্দেশ করিতেছে।)

আবার, (৩) পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ চিরকাল ॥
তার বলদের হয় বাত।
ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে হানি ॥—খনা

এবং (৪) ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।
সবংশে মলো রাবণ-শালা ॥—খনা

এই ছড়াগুলি প্রাচীন কুসংস্কারেরই দ্যোতক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ কৃষি সম্বন্ধে কোন কুফল আশঙ্কা করিয়াই এইরূপ নিষেধাত্মক বাণী প্রচারিত হইয়াছিল।

নিম্নের কতিপয় উদাহরণ আবহাওয়া এবং জ্যোতিষিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

(১) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥—খনা

(২) কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
বলগে চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় হ'বে কাল॥ --খনা

(৩) চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥ --খনা

(৪) আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা॥
যদি বর্ষে মুষলধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা।
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সয় মেদিনী॥
হেসে চাকি বসে পাটে।
শস্য সেবার না হয় মোটে॥- খনা

(৫) করকট ছরকট সিংহ সুকা কন্যা কানে কান।
বিনা বায়ে বর্ষে তুলা কোথা রাখবি ধান॥—খনা

(৬) শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষ খোড় কেবল মাত্র॥

শস্য সম্বন্ধে যত্ন লইতে খনার যে সব উপদেশ চলিত আছে তাহার কিছু নমুনা এইস্থানে দেওয়া গেল।

(১) মানুষ মরে যাতে।
গাছলা সারে তাতে॥-- খনা

(২) শুন বাপু চাষার বেটা॥
বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥
দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া ভুঁই বাড়্বে ঝাড়ে॥—খনা

(৩) লাউ গাছে মাছের জল।—খনা

(৪) ধেনো মাটীতে বাড়ে ঝাল।—খনা

দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালি ছন্দে খনার অনেক বচন রচিত হইয়াছে। যথা,—

(১) আমে ধান। তেতুলে বান ॥—খনা

(২) অঘ্রাণে পৌটি।
পৌষে ছেউটি ॥
মাঘে নাড়া।
ফাল্গুনে কাড়া ॥

(৩) বামুন বাদল বান।
দক্ষিণা পেলেই যান ॥—খনা

এইরূপ অসংখ্য প্রবচনে "খনার বচন" পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রবচনের ক্রমে ভাষাগত পরিবর্ত্তন হইলেও কিয়দংশ এখনও বেশ দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে। এই প্রবচনসমূহে দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ অংশের সহিত চর্য্যাপদ ও নাথপন্থী ছড়াগুলিতে ব্যবহৃত, দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষার তুলনা করা যাইতে পারে। হেঁয়ালিগুলির সরলার্থ বাহির করা কঠিন বটে। খনার বচনের অঙ্গে প্রাচীনতার যে চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত কতিপয় উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

(৪) শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি (রামাই পণ্ডিত)

"ধর্ম্ম" নামে কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে এই পুথিখানি রচিত হয়। এই পুথির রচনাকারী রামাই পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি। রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য একটি মত এই যে ইনি গৌড়ের পালরাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। ইহা সত্য হইলে রামাই পণ্ডিত ১০ম।১১শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া গৌড়ের পালরাজবংশে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তবে এই সময় দণ্ডভূক্তিতে বা বর্দ্ধমানে এক ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। তিনি সাময়িক-ভাবে গৌড় দখল করিয়াছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। রামাই পণ্ডিত ও তাঁহার রচিত শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিয়া অনেক তর্কের অবতারণা হইয়াছে। যাহা হউক রামাই পণ্ডিতের জীবন-কথা এইরূপ:—তিনি বাইতি জাতীয় ছিলেন। রাঢ়দেশের অন্তর্গত দ্বারকা নামক স্থানে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল এবং তিনি খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ও দারুকেশ্বর নদীতীরস্থ চম্পাইঘাট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৎসর আমাদের জানা নাই তবে তিনি খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। রাঢ়দেশের "হাকন্দ"[১] (বাঁকুড়া জেলা) নামক স্থানে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়", প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে—"ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ। ৮০ বৎসর বয়সে শুধু ধর্ম্ম-পূজা প্রচলনের অভিপ্রায়ে রামাই পণ্ডিত কেশবতী নাম্নী রমণীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্রের নাম ধর্ম্মদাস। রামাই পণ্ডিত বঙ্গীয় ধর্ম্ম-পূজার প্রধান পুরোহিত; প্রায় সকলগুলি ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যেই গ্রন্থকারগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শূন্যপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের "পদ্ধতি" এখনও মুদ্রিত হয় নাই।......রামাই পণ্ডিত যে ধর্ম্ম-পূজার প্রচলন করেন, তাহা

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশচন্দ্র সেন) গ্রন্থে আছে—"রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে যোগলাভ করেন। উহা চাপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে অবস্থিত।" শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তনিধির গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত বদনগঞ্জের নিকটেও "হাকন্দ" নামে একটি গ্রাম আছে।

মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত রূপ। ঐতিহাসিকগণের মতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম্মই কালে ধর্ম্মঠাকুররূপে পরিণত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের রচনার কতকগুলি অংশ অতি প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত, তাহার অনেকাংশ দুর্ব্বোধ্য। অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল অংশগুলি সম্ভবতঃ পুথিনকলকারগণ কর্ত্তৃক সহজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে।"

রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" বা "ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি"[১] নামক পুথি গোড়াতে যে তিনখানি পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি পুথির সহিত নগেন্দ্রনাথ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সংশ্লিষ্ট আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়গণ এই পুথিখানি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণ সম্পূর্ণ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতির অন্তর্গত ধর্ম্ম-পূজার মন্ত্রাদি সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন, "বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বিজয়পুর (বিজিপুর) গ্রাম নিবাসী শ্রীহরিদাস ধর্ম্ম-পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত তেরিজপাতের প্রাচীন পুথি হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মরাজের পূজার মন্ত্রাদি ও ব্যবস্থা লিখিত আছে। পুথির মোট পত্রসংখ্যা ৬০।" —বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড।

(ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি)

নিদ্রাভঙ্গ যাত্রা সিদ্ধি।
"যোগনিদ্রায় কর ভঙ্গ,
সব কর দেখ রঙ্গ,
    পরিহার তব চরণে।
উলূক সহিত যাচ্চ,
নিদ্রাভঙ্গ
    পরণাম করিব কেমনে॥
কিন্তু রামাই পণ্ডিত,
তব করভার।
নিদ্রাভঙ্গ যাত্রা সিদ্ধি, ধর্ম্মরাজার জয় জয়কার॥" ইত্যাদি।

(১) এই সম্বন্ধে কতক আলোচনা "ধর্ম্মমঙ্গল" আলোচনার অংশে করা গেল। ডাঃ সুকুমার সেন কতিপয় শূন্যপুরাণের পুথি পাইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মতে এই পুথি শূন্যপুরাণ, ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি বারমতি, অনিলপুরাণ প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে" "শূন্যপুরাণ" ও "ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি"কে দুইখানি গ্রন্থ হিসাবে এবং "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উভয়কে এক গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

রামাই পণ্ডিত ও তৎরচিত শূন্যপুরাণ নিয়া নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত সত্যই কি ১০ম।১১শ শতাব্দীর ব্যক্তি? সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতেই এইরূপ উক্তি আছে যে সম্রাট ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতী (লাউসেনের মাতা) রামাই পণ্ডিতের নিকট ধর্ম্ম-পূজার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি উত্তরবঙ্গের পালরাজবংশীয় দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। এই সম্রাট ধর্ম্মপাল কে তাহা নিয়া মতানৈক্য আছে। এই কথা মানিয়া লইলেও অবশ্য রামাই পণ্ডিতের কাল নিয়া তর্ক চলিতে পারে। আবার ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলিতে "গৌড়েশ্বর" কথাটি আছে—ধর্ম্মপালের পুত্রের অন্য কোন নাম নাই। তাহার পর প্রশ্ন রামাই পণ্ডিতের "পণ্ডিত" কথাটি লইয়া। রামাই পণ্ডিত "বাইতি" বা "ডোম" জাতীয় "পণ্ডিত" বা পুরোহিত না সত্যই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ দুইমত হইয়াছেন। কেহ কেহ "ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে বিস্তর" বাক্যটি দ্বারা এবং রামাই কর্ত্তৃক তৎপুত্র ধর্ম্মদাসকে ডোম হইবার অভিশাপের গল্পটির সাহায্যে রামাইকে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষী। আবার অনেকে রামাইকে ডোমজাতীয় ব্রাহ্মণ বা "ডোম-পণ্ডিত" ভিন্ন অধিক কিছু মনে করেন না।

শূন্যপুরাণ পুথির অকৃত্রিমতা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। শূন্যপুরাণের অন্যতম আবিষ্কারক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুথির মধ্যে বহুব্যক্তির হস্তচিহ্নের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তৎসম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুথিখানির হস্তলিপি ও ভাষাদৃষ্টে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ যে অপর কবির রচনা তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের অত্যাচারঘটিত বিবরণ, যথা—"নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অংশটি রামাই পণ্ডিত রচিত নহে, উহা সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের জনৈক কবি কর্ত্তৃক (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) রচিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। এই পুথির ভাষা স্থানে স্থানে খুব আধুনিক আবার স্থানে স্থানে খুব দুর্ব্বোধ্য, জটিল ও প্রাচীন। পুথিখানিতে অভিসন্ধিমূলক হস্তচিহ্ন রহিয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। "শূন্যপুরাণ" নামে অপর দুইখানি পুথিতে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশটি নাই।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্যপুরাণের পুথিখানিতে ভাষার পরিবর্ত্তন পুথি নকলের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার তাহা বলা কঠিন। কঠিন শব্দই সহজ হইয়াছে না সহজ শব্দ কঠিন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আমরা অক্ষম।

রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র ছিল, যথা—মাধব, সনাতন, শ্রীধর এবং ত্রিলোচন। ময়না নামক স্থানের যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক ধর্ম্মঠাকুরের ইহারা বংশানুক্রমিক পুরোহিত। ইহারা ৩৬ জাতির তাম্রদীক্ষা দিয়া থাকেন বলিয়া গৌরব করেন। এই পৌরহিত্য সত্ত্বেও এবং রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় প্রায়ই নামের সহিত "দ্বিজ" কথাটি যুক্ত থাকিলেও রামাই পণ্ডিতের দ্বিজত্ব এখন অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শূন্যপুরাণে ৫৬টি কাণ্ড। ইহার মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে রচিত এবং অপরগুলি ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ও রাজা হরিচন্দ্রের এবং অপরাপর ধর্ম্মের সেবকগণের ত্যাগের কাহিনীতে পূর্ণ।

সুধীবর্গের মতে আনুমানিক খৃঃ ১২শ শতাব্দীর কবি ময়ূরভট্ট ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে "হাকণ্ড-পুরাণ" নামক একখানি কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি খৃঃ ১১শ শতাব্দীর লোক। এই ময়ূরভট্টকে নিয়া এখন মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক নগেন্দ্রনাথ বসু এই হাকণ্ড-পুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ একই গ্রন্থ মনে করিয়াছিলেন। ময়ূরভট্টের রচিত হাকণ্ড-পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই দুই পুথি স্বতন্ত্র কেননা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শূন্যপুরাণের ধর্ম্মপূজার কথার সহিত রাজা হরিচন্দ্রের কাহিনী জড়িত এবং ময়ূরভট্টের হাকণ্ড-পুরাণ পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলগুলির আদর্শবিধায় লাউসেনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং কাহিনীর মিল নাই।

শূন্যপুরাণে নানা কাহিনী জড়িত আছে এবং পরবর্ত্তী যোজনায় "নিরঞ্জনের রুষ্মা"র কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী অপর ২।১খানি ধর্ম্মপূজার পদ্ধতির মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ সেন উল্লেখ করিয়াছেন।

শূন্যপুরাণ বৌদ্ধদের পুথি এবং ধর্ম্মঠাকুর সংগুপ্ত বুদ্ধ ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ডাঃ সেন প্রমুখ অনেক পণ্ডিতই তাহা মানিয়া লইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাতে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। পুথিখানিতে বৌদ্ধ ছাপ থাকিতে পারে, ধর্ম্মঠাকুরের প্রসঙ্গে বুদ্ধের কথা

মনে হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মঠাকুরও বুদ্ধ নহেন এবং শূন্যপুরাণও বৌদ্ধ পুথি নহে। ধর্ম্মঠাকুর নানা স্থানে নানা নামে পরিচিত কোন লৌকিক দেবতা। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের সহিত "শঙ্খপাবনের" শঙ্খ ও ধর্ম্মঠাকুরের "ধর্ম্ম" কথাটি যুক্ত করা সমীচীন নহে। অহিংসামূলক দুই একটি কথা কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বে কিছু বৌদ্ধ মতের সাদৃশ্য ধর্ম্মঠাকুরকে বুদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নহে। "নিরঞ্জনের রুষ্মা"র মধ্যেও বৌদ্ধগন্ধের আবিষ্কার সমর্থনযোগ্য নহে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে পুনরায় এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাইবে। শূন্যপুরাণের "শূন্য" কথাটি বৌদ্ধ "শূন্য"বাদ এবং শৈবতান্ত্রিক "বিন্দু"বাদ উভয়ই বুঝাইতে পারে। "শূন্য"কে "বিন্দু" মনে করিলে ক্ষতি কি? এই সব শব্দের ব্যাখ্যা নানারূপই হইতে পারে সুতরাং "শূন্য" শব্দ দেখিলেই বৌদ্ধ গন্ধ আবিষ্কারের কোন অর্থ হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালায় শূন্যবাদী হীনযানী বৌদ্ধগণের পরিচয় নাই। যাহা আছে তাহা দেবতার পরিবর্ত্তে বোধিসত্ত্ববিশ্বাসী তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণ সম্বন্ধে, বলা যাইতে পারে। শূন্যপুরাণের কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

ছিষ্টি-পত্তন।

(ক) "নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্নচিন।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাত্তি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরুমন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবার দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥
রিষি যে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পর্ব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
পূণ্য থল নহি ছিল নহি ছিল গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর নহি সুরনর।
বম্ভা বিষ্ণু ন ছিল ন ছিল মহেশ্বর॥
বারবরত নহি ছিল রিষি যে তপসী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বারানসী॥

পৈয়াগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার॥
দশ দিকপাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল যমের তাড়ন॥

*   *   *   *

শ্রীধর্ম্ম চরণারবিন্দে করিয়া পণতি।
শ্রীযুত রামাই কঅ শুনরে ভারতী॥"—শূন্যপুরাণ।

শূন্যপুরাণের বহুস্থানে পুথি নকলকারীগণ হস্তক্ষেপ করাতে মূল পুথি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত অংশের বানান প্রাকৃত মতানুযায়ী হইলেও ভাষা যে তত প্রাচীন নহে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাও বেদ এবং হিন্দু পুরাণের অনুকরণ মাত্র। প্রথমে কিছু ছিল না পরে ক্রমে সব সৃষ্টি হইল এইরূপ মত পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মমতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত গদ্য অংশের ভাষা যে খুব পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চনা-পাবন।

(খ) "দুআরিরে ভাই ধর গিআ তুম্মারে দণ্ডর নন্দন।
পচ্ছিম দুআরে দানপতি যাঅ।
সোণার জাঙ্গালে পথ বাঅ॥
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
বসুআ আপুনি আইল সেইত বরণর চনা॥
শেতাই পণ্ডিত চারিশঅ গতি।
চন্দ্রকোটাল নাহি ভাঙ্গ এ চনার বিবেচনা॥" ইত্যাদি।

—শূন্যপুরাণ।

উল্লিখিত দুর্ব্বোধ্য অংশে শেতাই পণ্ডিত ও চন্দ্রকোটাল বোধ হয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী সশিষ্য দ্বারপণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রমশিলার সঙ্ঘারামের নাম করা যাইতে পারে। চন্দ্রকোটাল কে ছিলেন তাহা নিয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে (নগেন্দ্রনাথ বসু—ময়ূরভঞ্জ সার্ভে রিপোর্ট) তিনি চন্দ্রসেনা ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রগোবি আবার কাহারও মতে (Dr. Burgess) তিনি দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর।

(গ) "হে ভগবান বারভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি সেবক হব.সুখি ধামাৎ কল্লি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি।"—শূন্যপুরাণ (পৃঃ ৭০)

শূন্যপুরাণে কিছু কিছু প্রাচীন গদ্যের নমুনা রহিয়াছে। উপরোক্ত অংশ প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্যের উদাহরণ কি না তাহা বিবেচ্য। অবশ্য এই গদ্যে পরবর্ত্তী যোজনা (বা ইহার পরিবর্ত্তন) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের অবকাশ আছে।

শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশটি অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলোদ্দিপক। অংশটি অবশ্য পরবর্ত্তী যোজনা ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। যথা,—

(ঘ) জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘরবেদি
কর লয় দুন।
দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাহি পায়
সাঁপ দিয়া পুরায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর দিলঅ কর দুন—
দখিন্যা মাগিতে যায় যার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিস পাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দশবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস॥
বেদ করে উচ্চারণ বেরাাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।

চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইলা যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলে বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নুর।
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়া ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

—শূন্যপুরাণ।

উপরি লিখিত অংশে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার ও জাজপুরে ব্রাহ্মণগণের উপর মুসলমানগণের আক্রমণে ধর্ম্মপূজকগণের আনন্দ প্রকাশ পরবর্ত্তী যোজনা হইলেও ইহা হয়ত কোন সত্য ঘটনার সন্ধান দিতেছে। এই হিসাবে ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্যও থাকিতে পারে। হিন্দু দেব-দেবীগণের সহিত মুসলমান পীর-পয়গম্বর প্রভৃতির পাশাপাশি যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ভণিতায় রামাই পণ্ডিতের বেনামীতে কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী) অলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সন্ধানও

দিয়াছেন। নতুবা হিন্দু দেব-দেবী ও মুসলমান পীর-পয়গম্বরের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইত না।

(ঙ) রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতির" ভাষা তত পুরাতন বোধ হয় না। এই গ্রন্থ মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কেন না ইহাতে "শূন্যবাদ" প্রচারিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধ মত "মহাযানী" বলিয়াও যুক্তি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি "শূন্যবাদ" মহাযানী মত নহে—ইহা হীনযানী মত। সুতরাং মহাযানী মতের পোষক গ্রন্থে ইহার প্রচার সম্ভবপর নহে। মোট কথা, এই পুথি হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে অনেক পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে। শৈব মত অনেক পরিমাণে শূন্যবাদের পরিপোষক। ইহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতির স্তব।

* * * *

"আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোঁসাঞি,
করপদ নাস্তি কায়া।
নাহিক আকার, রূপগুণ আর
কে জানে তোমারি মায়া॥
জন্ম জরা মৃত্যু, কেহ নাহি সত্য,
যোগীগণ পরমাধ্যায়।"—ইত্যাদি।
শূন্যমূর্ত্তি দেবশূন্য অমুক[১] ধর্ম্মায় নমঃ।—ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতি।

শূন্যপুরাণে বর্ণিত ধর্ম্ম, আদ্যা, শঙ্খ ও শিব কোনটিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইঙ্গিত করে না। ধর্ম্ম ও শঙ্খ কথা দুইটি হিন্দু মতের গ্রন্থাদিতে প্রচুর রহিয়াছে। "বুদ্ধ", "ধর্ম্ম" ও "সংঘ"—বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই ত্রিরত্নের বা পবিত্র বাক্যত্রয়ের মধ্যে "ধর্ম্ম" ও "সংঘে"র দ্যোতক রূপে শূন্যপুরাণের ধর্ম্মঠাকুরকে ও শঙ্খ-পাবনের শঙ্খকে গ্রহণ করার কোনই হেতু দেখা যায় না। এইরূপ শক্তিদেবী আদ্যা হিন্দুতান্ত্রিক মতে বিশেষ পূজনীয়া এবং চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা। অনেক হিন্দুতন্ত্র গ্রন্থে আদ্যা দেবীর উল্লেখ আছে।

শূন্যপুরাণে শিবঠাকুরের কথাও আছে। ইহা আকস্মিক নহে। নির্গুণ ও সগুণ শিবের অনেক পরিচয়ই এই ধর্ম্মঠাকুর উপলক্ষে পাওয়া যাইবে।

১। বিভিন্ন ধর্ম্মরাজের কাহারও নাম এইখানে করিতে হয়।

অবশ্য শিবঠাকুরের কথা শূন্যপুরাণে পরবর্ত্তী যোজনা অথবা কাহিনীতে প্রসঙ্গ-ক্রমেও উল্লিখিত হইতে পারে। কিন্তু শৈব ও বৌদ্ধচিহ্নযুক্ত ধর্ম্মঠাকুর প্রথমে শিবঠাকুরের প্রতীক কি না তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব চিহ্নও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই স্থানে শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "শিবের গানের" কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। এই শিব কৃষি-দেবতা। মহাযানী বৌদ্ধগণ শিবঠাকুরকে বুদ্ধ অপেক্ষা নিম্নস্থান দিলেও মান্য করিতেন। ইহা ডা: দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত। তিনি এবং অনেক সুধীজন ধর্ম্মঠাকুরকে বুদ্ধের সহিত অভিন্ন কল্পনাও করিয়াছেন। আমাদের মতে, মহাযানী বৌদ্ধগণ শিবঠাকুরকে সব সময় বুদ্ধের নিম্নে স্থান দিয়া থাকেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বামী প্রণবানন্দের মতে কৈলাশ পর্ব্বতে শিব-দুর্গার নিম্নে বোধিসত্ত্বগণ বিরাজ করেন। তিব্বতি বৌদ্ধগণের এই বিশ্বাসের কথা তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধ এক এই অভিমতও আমরা সমর্থন করি না।

শিবের গান।

"আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
* * * *
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোসাঞি কেওদাবাঘের ছড়॥"—ইত্যাদি।

—শিবের গান, রামাই পণ্ডিত।

শূন্যপুরাণে "শিবের গান" কেন অন্তর্ভুক্ত হইল তাহা আলোচনার বিষয়। শিবের গান অথবা শিবের কথার অবতারণা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। তবে শূন্যপুরাণের শিবের গানের ভাষাদৃষ্টে ইহাকে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের রচনা বলিয়াই বোধ হয়। এই অংশ "নিরঞ্জনের রুস্মার" ন্যায় হয়ত পরবর্ত্তীকালের যোজনা। কৃষি-দেবতা হিসাবে শিবঠাকুরের কথার অবতারণা "শিবায়ন" নামক পুথিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক সেই আদর্শে শিবঠাকুরকে শূন্যপুরাণে অবতারণা

পরবর্ত্তীকালের শিবায়নের প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া ধর্ম্মঠাকুর ও শিব অভিন্ন হইলে অথবা ধর্ম্মঠাকুরের উপর শিবঠাকুরের প্রভাব পড়িলে শূন্যপুরাণে তাহার উল্লেখ থাকা সম্ভব। ধর্ম্মঠাকুর ও শিবঠাকুরের গান যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল তাহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। সুতরাং শূন্যপুরাণে চাষ-বাসের মধ্য দিয়া উভয় দেবতার একত্ব বা নৈকট্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

"শূন্যপুরাণ" ও ইহার কবি রামাই পণ্ডিতকে নিয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি রামাই পণ্ডিতের সময় সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কাব্যের উল্লেখ মানিয়া লইয়া "শূন্যপুরাণ" ও "ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতি"কে "আদিযুগের"ই অন্তর্গত করা গেল।

অষ্টম অধ্যায়

গোপীচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয়

"গোপীচন্দ্রের গান" ও "গোরক্ষ-বিজয়" (বা "মীন-চেতন") নামক দুইখানি প্রাচীন পুথি "নাথসাহিত্য" বা "নাথগীতিকা" নামে পরিচিত। "গোপীচন্দ্রের গান" যে বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত তাহা গোপীচন্দ্র, গোবিচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র নামক বাঙ্গালার কোন তরুণ রাজার সাময়িক সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে। এই গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম রাজা মাণিকচন্দ্র এবং মাতার নাম রাণী ময়নামতী। কোন কোন মতে রাজা মাণিকচন্দ্রের রঙ্গপুরের অন্তর্গত "পাটিকা" (বর্ত্তমান নাম পাটিকাপাড়া, থানা জলঢাকা) নামক স্থানে রাজধানী ছিল। আবার মতান্তরে কেহ কেহ বলেন "পাটিকা" ত্রিপুরার অন্তর্গত "পাটিকারা" নামক একটি পরগণা। ইহারই পার্শ্বে "মেহারকুল" নামক পরগণা। রাজা মাণিকচন্দ্র ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন মাণিকচন্দ্র মেহারকুল পরগণার রাজা ছিলেন। ময়নামতীর নামে ত্রিপুরা অঞ্চলে একটি পাহাড় এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজা মাণিকচন্দ্রের কিছু ভূসম্পত্তি উত্তরবঙ্গের পাল-রাজত্বাধীনে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে অনেক অজ্ঞাতনামা কবি প্রাচীনকালে ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। এই ছড়াগুলি শুধু যে "গোপীচন্দ্রের গান" নামে পরিচিত তাহা নহে। "ময়নামতীর গান", "মাণিকচন্দ্র রাজার গান", "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" প্রভৃতি নামেও ইহা পরিচিত। ছড়াগুলি একই কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন কবির রচনা। নাথপন্থী যোগী জাতির প্রিয় রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী গাহিয়া এক শ্রেণীর লোক সেকালে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত। এইরূপ নাথপন্থী যোগী জাতির মধ্যে প্রচলিত সাধু গোরক্ষনাথের চিত্তসংযমের অপূর্ব্ব কাহিনী "গোরক্ষ-বিজয়" ও "মীন-চেতন" উভয় নামেই রচিত হইয়া গীত হইত এবং লোকরঞ্জন করিত।

এই রাজা মাণিকচন্দ্রের ও গোবিন্দচন্দ্রের সময় নির্দ্ধারণ নিয়া নানারূপ আলোচনার সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-ভারতের তিরুমলয়ে প্রাপ্ত শিলালিপি (১০২৪ খৃঃ) এই রাজাদ্বয়ের সময় নির্দ্ধারণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

উত্তর বাঙ্গালার রাজা প্রথম মহিপালের সমসাময়িক, দক্ষিণ-ভারতের চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোলের কাল ১০৬৩—১১১২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। তিরুমলয়ে প্রাপ্ত রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি বরেন্দ্রভূমির রাজা মহিপালকে এবং গোবিন্দচন্দ্র নামে বঙ্গের কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা মাণিকচন্দ্র একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" শীর্ষক একটি প্রাচীন ছড়া মন্তব্যসহ এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে (Vol. 1, Part III, 1878) প্রথম জনসাধারণে প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে তৎপূর্ব্বে বুকানান সাহেব কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। গ্রীয়ারসন সাহেবের উৎসাহের ফলে এই দেশের সুধীবর্গ নাথপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে যে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেন তাহাতে বাঙ্গালা প্রদেশ ও ইহার বাহিরে গানগুলির বিভিন্ন আকারে অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার একটি মোটামুটি তালিকা প্রদত্ত হইল:

(১) মাণিকচন্দ্র রাজার গান (১১শ-১২শ শতাব্দী)

(গ্রীয়ারসন সঙ্কলিত)

(২) গোবিন্দচন্দ্রের গীত (পুথি ময়ূরভঞ্জের যোগী জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত; দুইশত বৎসরের প্রাচীন পুথি—১১শ-১২শ শতাব্দী)

(৩) ময়নামতীর গান (রঙ্গপুর নীলফামারি হইতে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)

(৪) রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গান—

১১শ শতাব্দীর একটি প্রাচীন ছড়া হইতে সম্ভবত: ১৭শ শতাব্দীর কবি দুর্ল্লভ মল্লিক কর্ত্তৃক রচিত। সুতরাং ইহা পরবর্ত্তী কালের একটি সংস্করণ মাত্র। এই গানটি শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

(৫) ময়নামতীর গান—

শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক চুঁচুড়ার কোন বৈষ্ণবীর নিকট পুথিটি প্রাপ্ত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা দুর্ল্লভ মল্লিকের প্রাচীন গানের নূতন সংস্করণ।

(৬) গোপীচাঁদের পাঁচালী—

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের ভবানী দাস রচিত ও মুন্সী

আব্দুল করিম কর্ত্তৃক ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে সংগৃহীত। কবির চারিখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

(৭) "যোগীর পুথি" বা "ময়নামতীর পুথি" (গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস)—

রঙ্গপুর সিন্দুরকুসুম গ্রামনিবাসী সুকুর মহম্মদ রচিত ও উত্তর-বঙ্গের রঙ্গপুর জেলায় সংগৃহীত।

(৬) ও (৭) নং পুথি দুইখানি "গোপীচন্দ্রের গান" নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(৮) গোরক্ষ-বিজয় বা মীন-চেতন (সম্ভবতঃ ভিন্ন নামে একই পুথি)—

ইহা কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামাদাস সেন ও সেখ ফয়জুল্লার ভণিতাযুক্ত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে লেখক একমাত্র সেখ ফয়জুল্লা। এই ব্যক্তি পুথিখানির সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। ইহার সময় সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দী। গোরক্ষ-বিজয় পুথিখানির আধুনিক সম্পাদক মুন্সী আব্দুল করিম ও প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

এক সময়ে গোপীচন্দ্রের গানের জনপ্রিয়তা সমধিক ছিল। এই গানের ভারতব্যাপী খ্যাতির প্রমাণ এই যে কবি লক্ষণদাস হিন্দী ভাষায় এই গান রচনা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশেও গোপীচন্দ্রের গানের প্রচলন আছে। এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বিবরণে জানা যায়—"শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিবিধ কবির রচিত "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।" (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড)।

এখন নাথপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম সমস্যা—নাথপন্থী সাহিত্য কোন যুগের সাহিত্য? ইহা আদিযুগের না মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্তর্গত? দ্বিতীয় সমস্যা—ইহার শ্রেণীবিচার লইয়া। এই সাহিত্য চর্য্যাপদের সমগোত্রিয়—না ধর্ম্মমঙ্গল, ভাটগান, শিবায়ন অথবা পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার লক্ষণাক্রান্ত? তৃতীয় সমস্যা—গোবিন্দচন্দ্র, পাল রাজাদের কেহ না অপর কোন বংশীয়? এই রাজা পালবংশীয় হইলে অন্ততঃ গোপীচন্দ্রের গান পালবংশীয় কোন রাজার স্তুতিবাচক গান নহে তো? চতুর্থ সমস্যা—বাঙ্গালাদেশের এই গানের এত ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তার কারণ কি? ইহা কি তবে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজা হিসাবে বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক? এই চারিটি সমস্যা সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

নাথ-গীতিকা চর্য্যাপদ, ডাকের বচন, খনার বচন ও শূন্যপুরাণের সহিত সময়ের দিক দিয়া নাথ-গীতিকাগুলিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় কি না অর্থাৎ আদিযুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত কি না এরূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। নাথ-গীতিকার সহিত তুলনীয় অপর রচনাগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ইহাদের বিষয়-বস্তু পুরাতনতো বটেই, তবে ইহা ছাড়া রচনাকারীদের সময় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সঠিক কিছু জানা যায় না। অবশ্য যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হইলেও কবি ও তাঁহার রচনা মূলতঃ প্রাচীন বলিয়া মনে হইলে তদনুরূপ গ্রহণ করিতে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। কোন প্রচলিত ছড়ার কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলে ইহার তিনটি দিক লক্ষ্য করা যাইতে পারে : উহার ভাব এবং বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনাকারী। ভাষা ও রচনাকারীর সময় লক্ষ্য করিয়া কোন প্রাচীন পুথির সময় নির্দ্দেশ করিবার আমরা অধিক পক্ষপাতী।

বিষয়বস্তু ও তাহার ভাব যদি পুরাতন হয় আর কবি যদি আধুনিক হয় তবে সেইরূপ রচনাকে আধুনিকই বলিব। রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও বিষয়বস্তু পুরাতন কিন্তু এখন যদি কোন কবি এই পুথিগুলি লেখেন তবে এই রচনাগুলিকে অবশ্য আধুনিকই বলিব, পুরাতন বলিব না।

আবার ভাষা ও কোন সময়ের ইঙ্গিত অথবা রচনার কোন বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর (technique) সাহায্যেও কোন পুথি পুরাতন না নবীন তাহা সাব্যস্ত হইতে পারে। কোন রচনার বিষয়বস্তু পুরাতন বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও অনেক সময় তাহার মূল রচনাকারী কে তাহা সঠিক জানা যায় না। হয়ত এই সম্বন্ধে আমাদের শুধু কিংবদন্তী সম্বল। তেমন রচনা ছড়ার আকারে যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে নব কলেবর প্রাপ্ত হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় তেমন রচনাকে (যেমন "খনার বচন" ও "ডাকের বচন") আমরা পুরাতন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিব।

"নাথ-গীতিকা" প্রথমে কোন্ কবির রচনা তাহা আমরা জানি না। ইহা প্রাচীন ছড়া হিসাবে কোন প্রাচীন কবির নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। যোগী বা জুগী জাতীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক ইহা সুদীর্ঘকাল যাবৎ শুধু মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। এক সময় যোগীগণ এই গান দ্বারে দ্বারে গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। গ্রীয়ারসন সাহেব লোকমুখে এইরূপ গান শুনিয়া উহা সংক্ষেপে কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই গান প্রাচীনই মনে হয়। কিন্তু যে আকারে অধিকাংশ ছড়াগুলি আমরা এখন পাইতেছি তাহার ভাষা প্রাচীনতা

ও আধুনিকতা মিশ্রিত। বহিরঙ্গে যত আধুনিকতাই থাকুক না কেন, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ গীতিকাগুলিকে প্রাচীন বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। এই গীতিকাগুলির কোন কোনটির সহিত নানা কবির নাম জড়িত আছে। এই সব কবি খুব পুরাতন নহেন, সুতরাং আদিযুগে তাঁহাদিগকে ধরা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে "রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গানের" কবি দুর্লভ মল্লিকের সময় খৃঃ ১৭শ শতাব্দী বলিয়া ধার্য্য হওয়াতে তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এইরূপ "গোপীচাঁদের পাঁচালী" নামক ছড়ার কবি ভবানী দাসের কালও খৃঃ ১৮শ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আবার "গোরক্ষ-বিজয়" নামক ছড়ার রচয়িতা চারি কবির মধ্যে একজন মুসলমান (সেখ ফয়জুল্লা) এবং তিনিই প্রধান কবি। এইরূপ "যোগীর পুথি" ও "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের" রচয়িতা সুকুর মহম্মদও একজন মুসলমান কবি। ইহা বিস্ময়ের বিষয়ও বটে। অবশ্য ইহা মধ্যযুগের শেষের দিকে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং সৌহার্দ্দ্যের লক্ষণ। মুসলমান কবি সেখ ফয়জুল্লা ব্যতীত "গোরক্ষ-বিজয়" গীতিকার অপর তিনজন কবিই হিন্দু এবং তাঁহাদের নাম কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস ও শ্যামাদাস সেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত—সেখ ফয়জুল্লা খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর ব্যক্তি।

যদি উল্লিখিত কবিগণ গোবিন্দচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয় পুথিদ্বয় রচনা করিয়া থাকেন তবে পুরাতন বিষয়বস্তু ও ভাব থাকা সত্বেও এই পুথিগুলিকে আদিযুগের বলিবার উপায় নাই। এই হিসাবে পুথিগুলিকে মধ্যযুগের অন্তর্গত করিতে হয়। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ উল্লিখিত কবিগণ আদি রচনাকারী নহেন, শুধু সংগ্রাহক মাত্র। এই প্রাচীন কাহিনীসমূহ ছড়ার আকারে বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল। ইহাদের মূল কবিগণের নাম পর্য্যন্ত এখন লোপ পাইয়া গিয়াছে। অনেক কাল পরে অন্য কবিগণ এই ছড়াগুলির পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন এবং সময়োচিত সংস্কার সাধন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম হইতেই ইহা শুধু মুখে মুখে রচিত ও গীত হইত কি না তাহা সঠিক বলা কঠিন। অনেক পরবর্ত্তীকালে হিন্দু ও মুসলমাননির্ব্বিশেষে এই ছড়াগুলির কবি ও গায়কগণ এইগুলি কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। ইহার ফলেই বিভিন্ন গ্রাম্য কবির নাম সংযোগে ছড়াগুলির অন্ততঃ কিয়দংশ লিখিত আকারে আমরা পাইতেছি। যাহা হউক, এই সব বিচার করিয়া এই

ছড়া বা গীতিকাগুলিকে আমরা আদি যুগের অর্থাৎ ১০ম-১১শ শতাব্দীর রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের যুগের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, কারণ আবিষ্কৃত নাথসাহিত্যের কবিগণ রচনাকরী বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুরাতন গানগুলির সংগ্রাহক ও সংস্কারক মাত্র, মূল কবি নহেন।

যে শৈব-সন্ন্যাসীদের উপলক্ষে বা সংস্রবে চর্য্যাপদ, দোহা, শূন্যপুরাণ ও ডাকের বচন রচিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যেই নাথ-গীতিকারও প্রচলন ছিল। যোগী সম্প্রদায় এই শৈব-সন্ন্যাসীদিগকে মানিয়া চলিতেন। সম্প্রদায়গত ব্যাপারে নাথপন্থী সাহিত্যের সহিত চর্য্যাপদ ও শূন্যপুরাণ প্রভৃতির ঐক্য আছে। কতকগুলি শৈব-সন্ন্যাসী বা সিদ্ধাচার্য্যের নাম নাথ-সাহিত্যে ও চর্য্যাপদে সমভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য্য গোরক্ষনাথ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ, রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। "গোরক্ষ-সংহিতা" ইহার অন্যতম উদাহরণ।

গোরক্ষনাথের কাল নিয়া নানারূপ বিতর্ক আছে। খৃঃ ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন শতাব্দী নির্দ্ধারণ করেন। "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থে গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। উহা খৃঃ ৮ম শতাব্দীর রচনা। অথচ গোপীচন্দ্রের সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে গোরক্ষনাথের সময় খৃঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী ধার্য্য না করিয়া উপায় নাই।[১] ইহার সুমীমাংসা কবে হইবে তাহা আমাদের জানা নাই।

নাথপন্থী সাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্ব ও তান্ত্রিকতার সহিত চর্য্যাপদসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব ও তান্ত্রিকতার অপূর্ব্ব মিল রহিয়াছে। অথচ নাথ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু চর্য্যাপদের বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নাথপন্থী সাহিত্য কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাহিনীমূলক কতিপয় গীতিকথা। অপরপক্ষে চর্য্যাপদগুলি দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গানের বা ছড়ার সমষ্টিমাত্র। নাথ-সাহিত্যের মূল কবিগণের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু চর্য্যাপদ রচনাকারী সন্ন্যাসীশ্রেণীর কবিগণের নাম প্রত্যেক চর্য্যাপদের ভণিতায় রহিয়াছে। কাহিনীমূলক গানহিসাবে এতদ্দেশে প্রচলিত ভাটব্রাহ্মণগণ রচিত গান সমূহ এবং পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত গীতিকাসমূহের প্রচুর সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাথপন্থী সাহিত্য ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় বিষয়বস্তু হিসাবে প্রেমের

---

(১) তিব্বতের লামা তারানাথের (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) মতে চন্দ্রবংশীয় গোপীচন্দ্র নামে এক রাজার চাটিগ্রামে রাজধানী ছিল।

প্রাধান্য গীতিকাশ্রেণীর সাহিত্যের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে। আবার ধর্ম্মমঙ্গল ও শিবায়নজাতীয় কাব্যের সহিত নাথ-সাহিত্যের যে মিল রহিয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। শিবঠাকুর উপলক্ষে অথবা শিবঠাকুরের প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য রচিত এই সাহিত্যগুলির গল্পাংশে পার্থক্য থাকিলেও ধর্ম্মগত ও দেবতাগত আদর্শের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঐক্য বিরাজ করিতেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিবদেবতাকে কেন্দ্র করিয়াই যেন গল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। "মহিপালের গান" নামে পরিচিত উত্তর-বঙ্গের একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত পালবংশীয় রাজা প্রথম মহিপালের নামের সহিত জড়িত ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। এই গান আর এখন প্রচলিত নাই এবং থাকিলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। "মহিপালের গান" ও "গোপীচন্দ্রের গান" প্রসিদ্ধ রাজাগণের কীর্ত্তিপ্রকাশক হিসাবে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে হয়।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র কোন বংশীয় ছিলেন ইহা নিয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি পাল রাজাদের সম্পর্কিত ছিলেন। আবার অপর মতানুসারে তিনি চন্দ্ররাজগণের কেহ ছিলেন। "বঙ্গে" (দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে) "চন্দ্র"বংশীয় রাজাদিগের অস্তিত্ব ও প্রতাপের অনেক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত মতই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু "চন্দ্র" উপাধিধারী রাজাগণের জাতি কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। এক প্রকার মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। গোপীচন্দ্রের গানের "বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রিকুল হেলায় হারামু" উক্তিটিতে অবশ্য গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষত্রিয়ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বোধ হয় সেকালে যে কোন জাতির রাজা মাত্রেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেন। ইহার ঐতিহাসিক সমর্থনও রহিয়াছে। আবার "বেনিয়াকুল" কথাটিতে ইহারা বণিক (সম্ভবতঃ গন্ধবণিক) কুলসম্ভূত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয়। আর একটি উক্তি উক্ত গীতে এইরূপ আছে, যথা—"এক ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বলি"। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের এই উক্তি তাঁহার "তাম্বুলি" (এক শ্রেণীর বৈশ্য) জাতীয় কোন ভ্রাতার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে গোবিন্দচন্দ্রও তো এই জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র রাণী অদুনা ও রাণী পদুনার পিতা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে আর এক সমস্যা দেখা দেয়। এই হরিশ্চন্দ্র "রাজবংশী জাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অথচ সাভারের নিকবর্ত্তী কোণ্ডাগ্রামবাসী ইহার বর্ত্তমান বংশধরগণ নিজেদিগকে "মাহিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা

পাইয়াছেন যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রও জাতিতে রাজবংশী ছিলেন। যাহা হউক প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও এই জাতিগত প্রশ্নটি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। অবস্থাদৃষ্টে আমাদের কিন্তু মনে হয় চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র জাতিতে বণিক (গন্ধবণিক) সুতরাং বৈশ্য ছিলেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। একটি কথা এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের বিবাহের প্রথা বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় তত কঠোর ছিল না। তৎকালে সম্ভবতঃ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিল। ইহা কতকটা বৌদ্ধপ্রভাবেরও ফল কি না জানি না। তবে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। এই সব কারণে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সঠিক জাতি নির্ণয়ে জটিলতার উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র যদি উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ পাল রাজাদের বংশীয় না হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্ররাজাদের কোন আত্মীয় হইয়া থাকেন তবে নাথ-সাহিত্যের গানগুলি পাল-রাজাদের স্তুতিবাচক গান নহে। তাঁহাদের উপলক্ষে আর একপ্রকার গানের সংবাদ জানা যায়। এই গানের নাম "মহীপালের গীত"। বৃন্দাবন দাসের (জন্ম ১৫০৭ খৃষ্টাব্দ) চৈতন্য-ভাগবতে পালরাজা মহীপালের স্তুতিবাঞ্জক গানের উল্লেখ আছে। কথাটি হইতেছে—

"যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত।
যাহা শুনিতে যত লোক আনন্দিত॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, বৃন্দাবন দাস।

এই "মহীপালের গীতের" কথা মদনপালের তাম্রশাসন পাঠেও অবগত হওয়া যায়। এই গান এখন পর্যান্ত উদ্ধার করা হয় নাই। অথচ আমরা ইহার সম্বন্ধে শুনিয়া আসিতেছি যে রঙ্গপুর ও দীনাজপুর জেলাদ্বয়ের অভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে নাকি এই গান এখনও গীত হইয়া থাকে, তবে এই উক্তির পক্ষে এখন পর্যান্ত কোন প্রমাণ বা এই গানের নিদর্শন আমাদের গোচরীভূত হয় নাই। "ধান ভানতে শিবের গীত" বলিয়াও একটি প্রাচীন উক্তি আছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "মহীপালের গীত" কথাটিই পরিবর্ত্তিত হইয়া "শিবের গীত" কথাটি প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করা যায় না।

নাথ-গীতিকার মধ্যে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে এত ছড়াই বা রচিত হইল কেন এবং এই বিষয়টি নিয়া সুদূর মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সাড়া পড়িয়া গেল কেন? গোপীচন্দ্র খুব বড় রাজা ছিলেন এবং সেইজন্যই গানগুলি ভারত-

ব্যাপী খ্যাতি পাইয়াছে এরূপ একটি মত থাকিলেও আমরা ইহার সমর্থন-যোগ্য কোন ভাল প্রমাণ পাইতেছি না। গোবিন্দচন্দ্র যে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন তাহা বাঙ্গালা ছড়াগুলিতে তেমন পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার গ্রাম্য ছড়ার বর্ণনায় তিনি ২২শ দণ্ড গমনোপযোগী রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইহা সত্য হইলে তাঁহার রাজত্ব বৃহৎ ছিল বলা যায় না। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত পুথিতে আছে এই রাজার "কটক" বা সৈন্যদল তিন ক্রোশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। এই বর্ণনা অবশ্য রাজার কিছু ক্ষমতার পরিচায়ক। আর যদি দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্র চোলের সহিত সত্যই গোবিন্দচন্দ্রের যুদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষমতাশালী রাজা বলাই সঙ্গত। রাজেন্দ্র চোল রাঢ়ের রাজা রণশূর, বঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও বরেন্দ্রের রাজা মহীপাল এই তিনজনকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তিরুমলয়ের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে। এখন শিলালিপির উক্তি বিশ্বাস করিলেও সমস্যা এই যে শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র কোন গোবিন্দচন্দ্র? তিনি ও নাথ-সাহিত্যের গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র এক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহা অনুমানমাত্র। এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলা ঠিক নহে।

নাথসাহিত্যের গোবিন্দচন্দ্রের বংশ-তালিকা আর একটি গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছে। এই বংশতালিকা বাঙ্গালা গীতিকাগুলিতে একপ্রকার, উড়িষ্যায় অন্যপ্রকার, আবার মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নাথসাহিত্যের প্রধান যোগীসন্ন্যাসী সিদ্ধাচার্য্য গোরক্ষনাথের সময় নিয়াও নানা দেশের বিভিন্ন মতবাদ নানা তর্কের কারণ ঘটাইয়াছে।

যাহা হউক, গোবিন্দচন্দ্র বড় রাজা ছিলেন বা তাঁহার সন্ন্যাসের কাহিনী বড়ই করুণ বলিয়া ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এই বিশ্বাস আমাদের নাই। আমাদের মনে হয় নাথপন্থী যোগীসম্প্রদায়ে ভারতের নানা প্রদেশের লোক ছিল এবং এই শৈব যোগীসম্প্রদায়ে নানা জাতির লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন কৈবর্ত্ত জাতীয় মৎস্যেন্দ্রনাথ ও হাড়ি বা ডোম জাতীয় হাড়িপা। সম্ভবতঃ বিভিন্ন প্রদেশে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার লোক হইতে পারেন, কিন্তু "জলন্ধরি" উপাধিযুক্ত গোরক্ষনাথ ও বালপাদ বা হাড়িপা পাঞ্জাব জলন্ধর অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।[১] যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর সহরে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে এবং

(১) বৌদ্ধ-গান ও দোহা (H. P. Sastri, Introduction) এবং Origin & Development of Bengali Language, (S. K. Chatterjee, Introduction) দ্রষ্টব্য

নেপালে গোরক্ষনাথের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। এমতাবস্থায় এই সম্প্রদায়ে কোন খ্যাতিমান রাজা যোগদান করিলে সেই রাজার কীর্ত্তিগাথা প্রদেশে প্রদেশে গাহিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগ এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছাড়িবেন কেন? কোন নরপতি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিলে যে সেই সম্প্রদায় লাভবান হয় তাহার প্রমাণ খৃষ্টানজগতে সম্রাট কনস্টানটাইন ও বৌদ্ধজগতে সম্রাট অশোক। সুতরাং গোবিন্দচন্দ্রের যোগীসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান ও সাময়িক সন্ন্যাস গ্রহণ বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যের চিরতরে সংসার ত্যাগের সমশ্রেণীতে না পড়িলেও উক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহা গৌরবের সহিত দেশে দেশে বিঘোষিত করিয়া থাকিবেন।

যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার মাতা এত খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ না হিন্দু? গোবিন্দচন্দ্রের গীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যারপর নাই।" এই অহিংসার বাণী হিন্দু সমাজে অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহা বৌদ্ধগন্ধী। হাড়িপার অনুগ্রহে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উক্তি—"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি। আপনি জলস্থল আপনি আকাশ। আপনি চন্দ্র-সূর্য্য জগত প্রকাশ।"—প্রভৃতি বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও দেবতার প্রভাবের অভাব সূচিত করে। অবার "জিয় জিয় রাড়ীর বেটা ধর্ম্মে দিউক বর"—উক্তিতে হয়তো শিবঠাকুরের প্রতীক হিসাবেই ধর্ম্মঠাকুরের উল্লেখ রহিয়াছে। আবার এই গীতগুলিতে শিবঠাকুরের প্রভাব এবং বেদান্ত ও যোগ-শাস্ত্রের মহিমার প্রচুর প্রচার রহিয়াছে। যাহা হউক বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের নানা দেবতার ছাপ বিভিন্ন সময়ে এই সম্প্রদায়ের মতবাদের উপর পতিত হইয়া ইহাকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের সেতু বা যোগসূত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। বুকানন সাহেব এবং গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে দলভ্রষ্ট কতিপয় শৈবসন্ন্যাসী হইতেই এই যোগীসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের মূল সুর তান্ত্রিকতা। তান্ত্রিকতা বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজের মধ্যেই প্রবেশলাভ করিয়া উভয়কে এমন একটি রূপদান করিল যে তাহার পর উভয়ের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ইহাদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িল। সুতরাং তান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ দেখিলেই তাহাকে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা সঙ্গত নহে, কারণ তাহা শৈব বা শাক্ত হিন্দুও হইতে পারে। সম্ভবতঃ যে সব অদ্ভুত ও বিসদৃশ ক্রিয়াকাণ্ড নাথসাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অধিকাংশই

হিন্দুতান্ত্রিকতা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতা নহে। বরং ইহাদিগকে শুধু তান্ত্রিক রীতিনীতির উদাহরণ বলাই অধিক সঙ্গত। এইগুলিকে "বৌদ্ধ" বা "হিন্দু" বলিয়া চিহ্নিত না করাই উচিত। এই গানগুলির ভিতরে রাণী ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সহিত আলাপের মধ্যে দেহতত্ত্বের উপদেশের সহিত যে সমস্ত আপত্তিজনক অংশ রহিয়াছে তাহা নিছক তান্ত্রিকগুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে সদুপদেশ দানের সহিত তুলনীয়। এই স্থানে হিন্দু বা বৌদ্ধ মত অভিব্যক্ত হয় নাই। রাণী ময়নামতীকে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক নানারূপ পরীক্ষা এবং হাড়িসিদ্ধা ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতির অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ, তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তিরই পরিচায়ক। তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তির ফলে এইরূপ অসাধ্যসাধনের সম্ভাবনা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজেই স্বীকৃত হইয়াছে।

হেঁয়ালির ভাষায় তান্ত্রিক মতের প্রচার, "অজপা কাহারে বলে জপে কোন জন" (গোরক্ষ-বিজয়) এবং "দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে" (গোরক্ষ-বিজয়) প্রভৃতি কথায় সুস্পষ্ট রহিয়াছে। আবার হেঁয়ালির ভাষায় ময়নামতী কর্ত্তৃক স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে সাবধান করিতে গিয়া দেহতত্ত্বমূলক উপদেশ উল্লেখযোগ্য।

"মানকচু পহরী তুমি থুইয়াছ হেজা !
খিজিরের হাতে তুম্মি সমর্পিলা গেজা ॥"

—(ময়নামতীর পুথি, ভবানী দাস)

ইহার সহিত গোরক্ষ-বিজয়ের* নিম্নের ছত্র দুইটির বেশ সাদৃশ্য আছে।

"কুকুরের মুখে গুরু রাখিয়াছ গেজা।
মানকচু পহরী যেন রাখিয়াছ সেজা ॥" —(গোরক্ষ-বিজয়)

এই হেঁয়ালির ভাষা উভয় পুথিতে প্রচুর পাওয়া যাইবে।

'মহাতেজে কুড়ালেতে সমর্পিলা গুরু।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গরু ॥" —(গোরক্ষ-বিজয়)

উল্লিখিত উপদেশসমূহে যোগীসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কে স্ত্রীজাতির প্রতি একটা কঠোর মনোভাব বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু।

এই পুথিগুলি পূর্ব্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল পরে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রথমে শুধু ধর্ম্মঠাকুররূপ বুদ্ধদেবকে মান্য করিয়া

---

* "গোরক্ষ-বিজয়" সাধু মীননাথের "কদলী" নামী স্ত্রীলোকের দেশে গমন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম বিসর্জন দেওয়াতে যে পতন হয় তদুপলক্ষে রচিত। সাধু গোরক্ষনাথ অবশেষে তাঁর গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেন।

পরে রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা এমনকি চৈতন্য-বন্দনা পর্য্যন্ত প্রচারে সাহায্য করিয়াছে এবং ইহাতেই পুথিগুলির জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এইরূপ একটি মত আছে। এই মত সম্পূর্ণভাবে সত্য না হইলেও আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে। ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধের ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে পুথিগুলিতে নানা দেবদেবীর উল্লেখ পরবর্ত্তী সময়ের লেখকগণের হস্তক্ষেপের ফল ইহা নিশ্চিত। এইজন্য গ্রীয়ারসনের আবিষ্কৃত এবং লোকমুখে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রচারিত মাণিকচন্দ্র রাজার গান ভিন্ন, এই জাতীয় অন্য সব গান পরবর্ত্তী বিভিন্ন সময়ে লিখিত বলিয়া তাহাতে নানা যুগের ধর্ম্ম ও সমাজের পরিবর্ত্তনের চিহ্ন এত বেশী রহিয়াছে যে অতি সাবধানতার সহিত এইগুলিকে গ্রহণ করিতে হয়। এই দিক দিয়া অন্ততঃ কতকগুলি পুথিকে মধ্যযুগের অন্তর্গত করা চলে কি না দেখা উচিত। অবশ্য তাহাতে এই জাতীয় সাহিত্যের ভাব, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতির দিকে পুথিগুলিকে আদিযুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত হইলেও লেখক বা কবি যদি সংগ্রাহক না হইয়া থাকেন তবে সেই সব কবির পুথি মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে।

নাথসাহিত্যের কবিত্ব গ্রাম্যজনোপযোগী হইলেও সরল উক্তি ও বর্ণনায় ইহা কবিত্বপূর্ণ। ধর্ম্মজনিত হেঁয়ালির ভাষা ছাড়া এই পুথিগুলিতে যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা মর্ম্মস্পর্শী সন্দেহ নাই। ভাষা সংস্কৃতপ্রভাবশূন্য ও অমার্জ্জিত হইলেও ভাব ও কবিত্বরসে পরিপূর্ণ। এই সাহিত্যের পুথিগুলিতে গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সন্ন্যাসের (বা দাম্পত্য প্রেম ও বৈরাগ্যের) আদর্শের একটি সংঘাত সৃষ্টি করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ধ্যান ও যোগ দ্বারা চিত্ত ও দেহকে পরিশুদ্ধ করিয়া এমন শক্তি অর্জ্জনের আভাস দেওয়া হইয়াছে যে তাহার কাছে দেবশক্তি পরাজিত হয়। এই পুথিগুলিতে এই হিসাবে গুরুর সাহায্যে ধ্যানধারণার উপদেশ আছে। ইহার ফলে এক শ্রেণীর সমালোচক "দেভাজু" (দেবপূজক) ও "গুভাজু" (গুরুপূজক) নামক দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন শেষোক্ত শ্রেণী অর্থাৎ নাথপন্থীগণ বৌদ্ধ, কারণ তাহারা দেবতায় নির্ভরশীল নহে। এই যুক্তি বহু ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। বৈদান্তিক মায়াবাদ ও জীবাত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে এই নাথসম্প্রদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই "নাথ" সম্পর্কে হাণ্টার সাহেব Annals of Rural Bengal গ্রন্থে "নাথ" জগতের কর্ত্তা

(Lord) অর্থে শিবঠাকুরকে মনে করিয়াছেন এবং বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা হইতে ইহার স্বপক্ষে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।[১]

নিম্নে রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প শ্রবণে রাণী অদুনার বিলাপের ভিতর যে প্রেমের চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব।

(ক) "না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পরে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দশ গিরির মাও বইন রবে স্বামী লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও।
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানি।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
* * * *
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘমাসি সিতে ঘেষিয়া রমু গাও॥
* * * *
খায় না কেন বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামীর পদতল॥
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাজা চরণ বেড়িয়া রমু পালাইয়া যাবু কোথা॥—ইত্যাদি।
—(মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গ্রীয়ারসন সংগৃহীত)

কবি দুর্ল্লভ মল্লিক "গোবিন্দচন্দ্রের গান" সংস্কার করিয়া প্রকাশ করেন

(১) ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশে (বিশেষ করিয়া শান্ রাজ্যে) প্রচলিত "Nut" (নাট্) দেবতার বা উপদেবতার পূজার সহিত বাঙ্গালার নাথধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি না কে জানে। "Nut" ও "নাথ"এর বানানাদৃশ্য বিস্ময়জনক। Lyde রচিত Asia গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ইহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই গানের মধ্যেও প্রেমের যে সুন্দর বর্ণনা কবি দিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

(খ) "অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥
তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্নপানি ॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥
* * * *
নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন।
তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী ॥
* * * *
না ছাড় না ছাড় মোরে বঙ্গের গোসাঞি।
তোমা বিনে উদুনা থাকিবে কোন ঠাঞি ॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥" ইত্যাদি।

—(গোবিন্দচন্দ্রের গান)

এই অনাড়ম্বর ছড়াগুলির ভিতর অন্তরের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য ও অনাবিল রসমাধুর্য্য অস্বীকার করিবার নহে।

———

নবম অধ্যায়

ব্রতকথা*

প্রাচীন বাঙ্গালার ব্রতকথাসমূহ বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগের এক বিশেষ অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত এই ধর্ম্মমূলক কাহিনীগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালার হিন্দু নারীসমাজের ধর্ম্মজীবনের একটি দিক উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলে প্রাচীনকালের বঙ্গনারীর ধর্ম্ম ও সামাজিক বুদ্ধি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় অনেক দেবদেবীর পূজা প্রচারের মূলে এই ব্রতকথাগুলি রহিয়াছে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক শাখার যে এই ব্রতকথাসমূহ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ডাঃ ইভান্স ক্রিটদ্বীপে প্রায় তিন হাজার বৎসরের পুরাতন যে সমস্ত মৃন্ময় মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন বাঙ্গালায় প্রচলিত ব্রতকথার অন্তর্গত মৃৎমূর্ত্তি-গুলির কোন কোনটির সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলি যত পুরাতনই হউক না কেন ইহাদের সম্পর্কিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে প্রাচীন ভাষার পরিচয় স্থানে স্থানে এখনও রহিয়াছে তাহার এবং আনুসঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ অন্যান্য প্রমাণের ফলে অন্ততঃ খৃঃ ৮ম। ৯ম শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রতকথাগুলির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব ব্রত ও তৎসংক্রান্ত কথাগুলি বহু প্রাচীন হইলেও ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হয় নাই বলিয়া এরূপ অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রতকথাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজের আদিযুগের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ব্রতকথাগুলি ধর্ম্মের দিকে যাহাই হউক, সাহিত্যের দিকে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। কথাসাহিত্যের অবলম্বন অবশ্য গল্প। এই গল্প সত্যও হইতে পারে, আবার কাল্পনিক অথবা উভয় মিশ্রিতও হইতে পারে। এইরূপ ইহা গদ্যে, পদ্যে

---

* Folk Literature of Bengal (D. C. Sen), History of Bengali Language and Literature ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (D. C. Sen) এবং মৎরচিত "বাঙ্গালার কথাসাহিত্য" (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত) ও "প্রাচীন বাঙ্গালার ব্রতকথা" (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন, ১৩৫৫) দ্রষ্টব্য। "বঙ্গলক্ষ্মীর" প্রবন্ধটিই এইস্থানে গৃহীত হইয়াছে।

অথবা মিশ্রিতভাবেও রচিত হইতে পারে। এমনকি কোন কোন কাহিনী গীত পর্য্যন্ত হইত। কথাসাহিত্যের বিভাগে বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রতকথা কোন্ শাখা বা প্রশাখার অন্তর্গত ? "গোপীচন্দ্রের গান" এবং "মহীপালের গান"ও কথাসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। আবার "শিবায়ন" এবং "মঙ্গলকাব্য"গুলিকেও এক হিসাবে কথাসাহিত্য ভিন্ন আর কি বলিব ? এইরূপ ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা এবং ভাট-ব্রাহ্মণগণের রচিত গানগুলিও কতকাংশে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কথা বা কাহিনী এই সকল শ্রেণীর সাহিত্যের মূল উপাদান হইলেও, এমনকি এই সব কাহিনী গীত হইলেও ইহাদের প্রধানভাগ কাব্যধর্ম্মী এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব, আদর্শ ও প্রকাশভঙ্গীর তারতম্য এইগুলিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

"মহীপালের গান" ও "গোপীচন্দ্রের গান"জাতীয় গানগুলি কোন রাজার সম্বন্ধে রচিত। আবার কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথাগুলি কোন দেবদেবীর স্তুতি উপলক্ষে রচিত সুতরাং উভয় শ্রেণীর গীতে উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যসমূহও কোন দেবতাবিশেষের পূজা প্রচারের জন্য রচিত কিন্তু ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে ব্রতকথা নারীসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ এবং একান্তই তাহাদের ব্যাপার। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে পূজিত হয় এবং ব্রাহ্মণগণ এই সমস্ত পূজায় পৌরহিত্য করেন। অথচ মূলে কোন ব্রতবিশেষের উপাখ্যান হইতেই ক্রমে মঙ্গলকাব্যের দেবতাবিশেষের পূজা ও স্তুতিবাচক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মঙ্গলচণ্ডীদেবী ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নাম করা যাইতে পারে। ব্রতকথাগুলির ভিতরে মঙ্গলকাব্যসাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল বলা যায়। কথা বা কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথাগুলি রচিত হইলেও ইহাদেরই একভাগ দেবতার খ্যাতিবৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে কাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া অন্ততঃ কতকগুলি মঙ্গলকাব্যের জন্মদান করিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকাগুলি কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ মানবসমাজের কথা এবং নর-নারীর অপূর্ব্ব প্রেমের অমর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই গীতিকাগুলি প্রেমের বেদীতে আত্মবলিদানের অসামান্য কাহিনীর মধ্য দিয়া একটি পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করিলেও পারিবারিক জীবনের আদর্শ স্থাপনে গল্পগুলির লক্ষ্য নাই। কিন্তু ব্রতকথাগুলির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের কাহিনী ভিন্ন আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনের

একটি উচ্চ ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ এই ব্রতকথাসমূহের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অবস্থাপন্ন ও অভিজাত শ্রেণীর লোকের গুণ বর্ণনায় দক্ষ ভাটগণের গানের সহিত "মহীপালের গান" বা "গোপীচন্দ্রের গানের" বিষয়গত প্রচুর সাদৃশ্য অথবা ঐক্য থাকিলেও ব্রতকথার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত ভাট-ব্রাহ্মণগণের গানের কোন মিল দেখা যায় না। এইরূপ চর্য্যাপদ ও শিবের "গাজন" গান এবং "শিবায়ন" গানের সহিতও ব্রতকথাগুলির ব্যবহারগত ও আদর্শগত কোন মিল নাই। শুধু কাহিনী ও গীত এই দুই বিষয় অবলম্বনে এই জাতীয় নানা শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে বলিয়া এই দিক দিয়া সকল প্রকার সাহিত্যেরই মিল রহিয়াছে, নতুবা আদর্শগত, ব্যবহারগত ও কাব্যগত নানা বিষয়ে এই সাহিত্যগুলি পরস্পর হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

কথাসাহিত্য গদ্যে লিখিত হইয়া অধুনা গল্প ও উপন্যাসের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে একদিকে গল্প ও উপন্যাস এবং অপরদিকে প্রাচীন কথাসাহিত্য তথা ব্রতকথার মধ্যে কত প্রভেদ! অথচ ইহারা সমস্তই কাহিনীমূলক সাহিত্য। তবে, গল্প ও ব্রতকথায় বরং কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। আধুনিক কথাসাহিত্য গল্প ও উপন্যাস কিম্বা মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতি বাদ দিলে প্রাচীন কথাসাহিত্য প্রধানতঃ চারি প্রকার। যথা—ব্রতকথা, রূপকথা, গীতি-কথা ও ব্যঙ্গ-কথা। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হিসাবে ব্রতকথাগুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার হিন্দু নারীগণ অনেক প্রকার ব্রত পালন করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে খুব প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই উভয় প্রকার ব্রতেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্রত যত প্রাচীন তাহার প্রকাশভঙ্গী, ভাষা এবং ভাবও তত প্রাচীন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যসম্রাট অশোক পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুশাসনে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রাচীন "মঙ্গলব্রতের" অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রতকথা উপলক্ষে নির্ম্মিত মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেতো ইতঃপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

এই সব ব্রতকথা কোন একটি বিশেষ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। দেবতার মূর্ত্তি মাটি ও চা'লের গুড়ার সাহায্যে নির্ম্মাণ করিয়া কুলবধূগণ নিজেদের পারিবারিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এই সব ব্রত পালন করিত।

ব্রতসমূহের কতিপয় দেবতাকে খুব প্রাচীন মনে হয়। এই ব্রতকথাগুলির ভাষাও কতকটা দুর্বোধ্য ও প্রাচীনতা মিশ্রিত।

এই সব প্রাচীন দেবতাদের নাম থুয়া, লাউল, ভাদুলি ও সেঁজুতি। ইহা ছাড়া সূর্য্যঠাকুর ও শিবঠাকুরের নামও এই উপলক্ষে কিছু পরিমাণে উল্লেখ-যোগ্য। নিম্নে এই দেবতাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(ক) থুয়া—

"থুয়া" নামটি অসংস্কৃত এবং অনার্য্যগন্ধী। "থুয়া" নামে পাঁচটি দেবতার পূজা এদেশের নারীসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সন্তান-সন্ততি কামনায় ও সাংসারিক অভাব-অনটনের হস্ত হইতে মুক্তি বাসনায় নারীগণ অগ্রহায়ণ মাসে থুয়া দেবতার পূজা করিত। এই থুয়া পূজার ভাষা অতি প্রাচীন। ইহার উদাহরণ এইরূপ—

"থু থু থুয়স্তি।
আঘণ মাসের জয়াস্তি॥" ইত্যাদি।

(খ) লাউল—

আর একটি দেবতার নাম এই উপলক্ষে করা যাইতে পারে। এই দেবতার নাম "লাউল" (লাঙ্গল ?)।

এই "থুয়া" ও "লাউল" নাম দুইটি এই দেশের নারীগণ কোথা হইতে পাইল তাহা বলা কঠিন। উভয়ের মূর্ত্তিই মৃত্তিকা ও চা'লের গুড়ার সাহায্যে নির্ম্মিত হইত। মূর্ত্তিগুলির আকৃতি অনেকটা পিরামিডের অনুরূপ এবং পূজা-বিধিও সংস্কৃত পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত নহে। এই দুই দেবতার পূজায় প্রাচীন বঙ্গের কৃষিসম্পদের প্রতি এই দেশের অধিবাসিগণের নির্ভরশীলতা ও আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

(গ) ভাদুলি—

নৌ-যাত্রার ও নৌ-বাণিজ্যের চিত্রহিসাবে আমরা আর একটি দেবতার পরিচয় পাই। এই দেবতার নাম "ভাদুলি" (ভাদ্র ?)। নৌ-যাত্রার আপদ-বিপদের কথা স্মরণ করিয়া ভাদুলি দেবতার অনুগ্রহ কামনা করা হইত। নারীগণ তাহাদের স্বামীপুত্রের জলপথে নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইয়া এই দেবতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত। স্ত্রীদেবতা ভাদুলির পূজোপলক্ষে নারীগণ "সাতসমুদ্র" ও "তেরনদীর" চিত্র অঙ্কিত করিত। এই ব্রত প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর জলপথে নানা দেশে গমনের ইঙ্গিত করে। এই দেবতার পূজা

ভাদ্রমাসে করা হইত। বোধ হয় বর্ষাকালে জলপথে যাতায়াত সুবিধাজনক-বোধে এইকালে নৌ-যাত্রার প্রথা ও তৎসংক্রান্ত পূজা প্রচলিত ছিল।

(ঘ) আর একটি ব্রত প্রচলিত ছিল, তাহার নাম "সেজুতি"। কুমারী কন্যাগণ বিবাহের পূর্ব্বে সেজুতি-ব্রত পালন করিত। সেজুতি সম্ভবতঃ কোন দেবী। ঐ দেবীর পূজায় অবিবাহিতা কন্যাগণ প্রার্থনার ভিতর দিয়া মনের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জানাইত তাহাতে মনে হয় তাহারা ভবিষ্যতে সপত্নীরূপ বিপদ নিবারণের জন্য এবং স্বামীপ্রেম কামনায় এই ব্রত পালন করিত।

প্রাচীন ব্রতকথাগুলির ভাষা তখন খুব দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রচলিত মনে হইলেও কোন এক সময়ে বোধ হয় এরূপ ছিল না। এইগুলির জটিল ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইলেও প্রাচীন ভাষার কিছু চিহ্ন এখনও ইহাদের গাত্রসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রাচীন ব্রতসমূহের অনুষ্ঠানের ভিতরে অনেক অপৌরাণিক উপাদানের অস্তিত্ব, দুর্ব্বোধ্য ভাষার প্রয়োগ, অপৌরাণিক দেবতার উল্লেখ, জলপথে বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ, কৃষিসম্পদের প্রতি অনুরক্তি, নারীগণের বাল্য ও যৌবনের আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রভৃতির যে অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তুলনা নাই। এই ব্রতসমূহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলিপনা ও চিত্রাঙ্কণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও খুব উচ্চ শ্রেণীর বলা যাইতে পারে।

এই ব্রতকথাগুলির কোন কোনটির ভিতরে দেখা যায় প্রথমে সমাজে ইহা প্রচলিত হইতে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ গৃহকর্ত্তার আপত্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বণিক সমাজের সহিত কতকগুলি ব্রতের বিশেষ সম্বন্ধও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার কারণ সঠিক বলা যায় না। ইহা আর্য্যেতর সমাজ হইতে আর্য্য সমাজে প্রচলনের ইঙ্গিত করে কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবীর পূজা প্রচলনের মধ্যে ইহার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এই দুই দেবী আর্য্যসমাজের বাহির হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবেন। প্রথমে ব্রতকথার আকারে এই দুই কাহিনী রচিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে ইহারা "মঙ্গলকাব্য" নামে এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ের আর্য্যসংস্কৃতির স্পর্শ কতকগুলি ব্রতকথার মধ্যে এক নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে। বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন ব্রতগুলিকে একেবারে তুলিয়া না দিয়া বরং রূপান্তরিত অবস্থায় ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রচারের কার্য্যে

এইগুলিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও বাঙ্গালা সাহিত্য এতদুভয়েরই পরম উপকার সাধিত হইয়াছে।

মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবী ভিন্ন লাউল ও ভাতুলি দেবতাদ্বয় সম্পর্কে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই পৌরাণিক রূপান্তরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে লাউল দেবতাকে শিবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং ভাতুলি দেবীকে দেবরাজ ইন্দ্রের শাশুড়ি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। শিব ও সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যেও কতকগুলি ব্রত ও প্রাচীন ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। উহাও কালক্রমে পুরাণগুলির প্রভাবে নবরূপ লাভ করিয়াছে।

ব্রতকথার ন্যায় গীতিকথা এবং রূপকথাসমূহের অনেক গল্পেও প্রাচীনত্বের আভাষ রহিয়াছে। গীতিকথার অন্তর্গত "মালঞ্চমালা"র গল্পটি ইহার অন্যতম উদাহরণ। রূপকথাগুলির মধ্যে জাতিবিশেষে আদিযুগে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর জীবনসংগ্রামের ও নারীপ্রেম লাভের জন্য দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনের ও অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান ইহাতে নিবদ্ধ আছে। রূপকথার কাহিনীগুলি শুধু শিশুমনেরই খোরাক যোগায় না, পরিণত বয়স্কদেরও চিন্তনীয় অনেক মূল্যবান বিষয়-বস্তু ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে। বাঙ্গালার আদিযুগ অংশের সাহিত্যে ব্রতকথার ন্যায় রূপকথা এবং গীতিকথাগুলিরও সম্যক পরিচয় লাভের প্রয়োজন আছে। হাস্যরসের উদ্রেককারী ব্যঙ্গকথার গল্পগুলির প্রয়োজনীয়তা ইহাদের তুলনায় অল্প। প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথার বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথার অবতারণা করা গেল। ব্রতকথা বা সমধর্ম্মী সাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া না হইলেও এক শ্রেণীর রচনার কথা এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ইহা "ছেলে ভুলানো ছড়া"। এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক ছড়ার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী সমাজের প্রাচীন চিত্র উদ্‌ঘাটনে ব্রতকথা, রূপকথা ও গীতিকথার ন্যায় এই জাতীয় ছড়াগুলি অল্প সাহায্য করে নাই। ব্রতকথার অন্তর্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয়জ্ঞাপক অনেক ছত্রের ভাবমূলক সাদৃশ্য এই ছড়াগুলিতেও রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "লোকসাহিত্য" নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা রহিয়াছে। ইহাতে অনেক প্রাচীন ও প্রচলিত ছড়াও উল্লিখিত হইয়াছে। কবিগুরুর অনবদ্য ভাষায়—"ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত

হইয়া আসিয়াছে ;—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে" ইত্যাদি। এই স্থানে এই জাতীয় অসংখ্য ছড়ার মধ্যে মাত্র তিনটি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল।

(ক) ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ী এসো।
সেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে ব'সো॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুত করে যেয়ো॥

—ছেলেভুলানো ছড়া।

(খ) ঘুঘু মোতি সই।
পুত কই।
হাটে গেছে॥
হাট কই।
পুড়ে গেছে॥
ছাই কই।
গোয়ালে আছে॥
সোনা কুড়ে পড়বি।
না—ছাই কুড়ে পড়বি॥

—ছেলেভুলানো ছড়া।

(গ) ওপারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম,
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥
এ মাসটা থাক, দিদি, কেঁদেককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে॥
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাপ দিয়ে পড়ি॥

—ছেলেভুলানো ছড়া।

---

(১) লোকসাহিত্য, ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।